তারুণ্য ও মর্যাদার ইশতেহার

জাতীয় নাগরিক পার্টি - এনসিপির নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬

প্রকাশক

জাতীয় নাগরিক পার্টি - এনসিপি

কেন্দ্রীয় অফিস

রূপায়ন ট্রেড সেন্টার, লেভেল ১৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা।

ফোন: +880 1759-209177

ইমেইল: contact@ncpbd.org

ওয়েবসাইট: https://ncpbd.org

ইশতেহার বিষয়ক যোগাযোগ: +8801315632587, +8801876044076

স্বত্ব

জাতীয় নাগরিক পার্টি - এনসিপি

সূচিপত্র

ভূমিকা	৫
জাতীয় নাগরিক পার্টি - এনসিপির ৩৬ দফা	৭
National Citizens Party (NCP)’s 36-Point	১১
১। নাগরিক অধিকার, নিরাপত্তা এবং ন্যায় বিচার	১৭
২। দূর্নীতিমুক্ত নাগরিক সেবা নিশ্চিতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা এবং আধুনিকায়ন	২০
৩। দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ	২৩
৪। লুটের অর্থনীতি থেকে ন্যায্য রাষ্ট্র: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ	২৯
৫। তারুণ্য ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৪৬
৬। আধুনিক শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন	৫১
৭। বিকেন্দ্রীভূত সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা	৫৪
৮। নারীর নিরাপত্তা, অধিকার ও ক্ষমতায়ন	৬২
৯। প্রবাসীর মর্যাদা ও অধিকার	৬৬
১০। পরিবেশ, জ্বালানি ও টেকসই উন্নয়ন	৬৯
১১। কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা	৮০
১২। পররাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব	৮৪

ভূমিকা

বাংলাদেশের রাষ্ট্রগঠনের ইতিহাস দীর্ঘ সংগ্রাম, আত্মত্যাগ এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস। প্রায় দুই শতাব্দীর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক-শ্রমিক-গণমানুষের ধারাবাহিক প্রতিরোধের পরিণতিতে ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে রাষ্ট্র পুনর্গঠিত হয়, কিন্তু শোষণ ও বৈষম্যের অবসান ঘটেনি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনা, সাংস্কৃতিক দমন এবং রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে আরও দীর্ঘ ২৩ বছরের সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সে সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু স্বাধীনতার পরও ৫৫ বছর পরেও সেই কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়নি। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দলীয়করণ, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, দুর্নীতি ও বিচারহীনতা এক ধরনের শাসন-সংস্কৃতিতে পরিণত হয়, গণতন্ত্র সংকুচিত হয় এবং নাগরিক অধিকার বারবার বাধাগ্রস্ত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় দেশে একটি ফ্যাসিবাদী শাসনকাঠামো গড়ে ওঠে, যেখানে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষমতাসীন স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে, বিরোধী মত দমন, গুম, বিচার বহির্ভূত হত্যা, অর্থ পাচার এবং সর্বগ্রাসী দুর্নীতি একটি স্থায়ী কাঠামোগত রূপ নেয়। অন্যদিকে, বিভাজিত, পরিবারতান্ত্রিক, জনবিচ্ছিন্ন রাজনীতি দেশের মানুষকে দিশা দেখাতে ব্যর্থ হয়।

জুলাই ২০২৪-এর ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণ-অভ্যুত্থান এই দীর্ঘদিনের অপশাসন ও ফ্যাসিবাদী কাঠামোর বিরুদ্ধে জনগণের ঐতিহাসিক রায়। এই গণ-অভ্যুত্থান কেবল সরকার পরিবর্তনের দাবি ছিল না, এটি ছিল বারবার স্বৈরতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের জন্ম দেয়া পুরনো বন্দোবস্তকে ভেঙ্গে ফেলা। হাজারো শহীদদের আত্মত্যাগ ও আহতদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত এই নতুন বাংলাদেশ আমাদের সামনে একটি বড় দায়িত্ব দিয়েছে। সেই দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কার করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত করা।

জাতীয় নাগরিক পার্টি - এনসিপি এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও জনআকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে। এনসিপি মনে করে, মৌলিক ও কাঠামোগত সংস্কার ছাড়া ফ্যাসিবাদী কাঠামোর পুনরুত্থান রোধ করা সম্ভব নয় এবং গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ অর্থে গণতান্ত্রিক রূপান্তরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এই বিশ্বাস থেকে এনসিপি “সেকেন্ড রিপাবলিক” নির্মাণের লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্র সংস্কার, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং নাগরিক অধিকার সুরক্ষার কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে।

এনসিপি গঠনের সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের লক্ষাধিক মানুষের থেকে লিখিতভাবে মতামত নিয়েছে। জানতে চেয়েছে তারা কেমন বাংলাদেশ দেখতে চায়, রাষ্ট্র পরিচালনার কোন সমস্যাগুলোকে তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, এবং কোন পরিবর্তনগুলো তারা বাস্তবে প্রত্যাশা করে। এই জনমত ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এনসিপি তার রাষ্ট্রকল্প, নীতিগত অবস্থান এবং রাজনৈতিক কর্মসূচির কাঠামো নির্ধারণ করেছে। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে মাসব্যাপী জুলাই পদযাত্রা কর্মসূচিতে এনসিপির নেতৃবৃন্দ দেশের প্রতিটি জেলায় জনগণের কাছে গিয়েছেন, তাদের কথা শুনেছেন এবং স্থানীয়

বাস্তবতা, সমস্যা ও প্রত্যাশার সরাসরি বিবরণ সংগ্রহ করেছেন। এই ধারাবাহিক জনসম্পৃক্ততা, মাঠভিত্তিক অভিজ্ঞতা এবং জনগণের মতামতই এনসিপির এতদিনের রাজনৈতিক অবস্থান ও নীতিগত প্রস্তাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে। তারই ভিত্তিতে এনসিপি ২০২৫ সালের ৩ আগস্ট তার দলীয় ২৪ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে চলমান রাষ্ট্র সংস্কার প্রক্রিয়ায় এনসিপি ধারাবাহিকভাবে সংস্কারের পক্ষে দৃঢ় ভূমিকা পালন করেছে। এনসিপি বিভিন্ন সংস্কার কমিশনে আনুষ্ঠানিকভাবে মতামত প্রদান করে এবং রাষ্ট্রের মৌলিক ও কাঠামোগত সংস্কারের পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করে। একইসাথে ঐক্যমত্য কমিশনে এনসিপি একটি গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে সংস্কারের পক্ষে সুস্পষ্ট ও দৃঢ় অবস্থান বজায় রাখে। এই সংস্কার প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই জুলাই সনদ প্রণীত হয়েছে এবং সেই সনদের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে গণভোট আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এনসিপির রাষ্ট্রকল্প, নীতিগত অবস্থান এবং সংস্কারভিত্তিক রাজনৈতিক দর্শনের ধারাবাহিকতায়ই আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০২৬ কে সামনে রেখে এই নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন ও ঘোষণা করা হচ্ছে।

এই নির্বাচনী ইশতেহার কোনো একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ধারণাপত্র নয়। এনসিপি দেশজুড়ে কৃষক, শ্রমিক, চাকরিজীবী, উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী, নারী, প্রবাসী, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী সহ নানা শ্রেনী ও পেশার মানুষ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে কথা বলে, অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে এই ইশতেহারের কাঠামো ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছে। জনগণের নিত্যদিনের সংগ্রাম, প্রত্যাশা ও রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক সমস্যা সবকিছু ভিত্তি করে একটি বাস্তবসম্মত ও সংস্কারমুখী রূপরেখা নির্মাণই এই ইশতেহারের উদ্দেশ্য।

এই ইশতেহারটি ১২টি ভাগে বিভক্ত, এবং সেই ভাগমসমূহ থেকে জনগণের জীবন ও রাষ্ট্র পুনর্গঠনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত ৩৬ দফা অগ্রাধিকার হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। ইশতেহারের প্রতিটি অঙ্গীকার ন্যায্যতা, বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এনসিপি নির্বাচনে জেতার জন্য জনগণকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ধোঁকা দিতে চায় না। বর্তমান অর্থনৈতিক ও সমাজ বাস্তবতায় আমাদের স্বপ্নের নতুন বাংলাদেশ গড়তে আগামী পাঁচ বছরে যতটুকু পরিবর্তন আনা সম্ভব, ততটাই এই ইশতেহারে এনসিপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এনসিপি সরকারের অংশ হলে রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণ, প্রশাসনিক উদ্যোগ এবং আইনগত সংস্কারের মাধ্যমে এই ইশতেহার বাস্তবায়নে কাজ করবে। এনসিপির সংসদ সদস্যরা জাতীয় সংসদে এই ইশতেহারের বাস্তবায়নের পক্ষে অবস্থান নেবে এবং প্রয়োজনীয় আইন ও নীতিগত উদ্যোগে অংশ নেবে। দল হিসেবে এনসিপি এই দাবিসমূহের পক্ষে ধারাবাহিক ও দৃঢ় রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করবে এবং জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বাস্তবায়নের তৎপরতা অব্যাহত রাখবে।

তারুণ্য ও মর্যাদার ইশতেহার

জাতীয় নাগরিক পার্টি - এনসিপির ৩৬ দফা

১. জুলাই সনদের যে দফাগুলো আইন ও আদেশের উপর নির্ভরশীল, তা বাস্তবায়নের সময়সীমা ও দায়বদ্ধ কাঠামো তৈরিতে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করা হবে।

২. জুলাইয়ে সংঘটিত গণহত্যা, শাপলা গণহত্যা, বিডিআর হত্যাকাণ্ড, গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাসহ আওয়ামী ফ্যাসিবাদের সময়ে সংঘটিত সব মানবতাবিরোধী অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক বিচার নিশ্চিত করা হবে এবং একটি ট্রুথ অ্যান্ড রিকন্সিলিয়েশন কমিশন গঠন করা হবে।

৩. ধর্মবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, সংখ্যালঘু নিপীড়ন এবং জাতি-পরিচয়ের কারণে যেকোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ, নির্যাতন ও নিপীড়নকে প্রতিহত করতে স্বাধীন তদন্তের এখতিয়ার-সম্পন্ন মানবাধিকার কমিশনের একটি বিশেষ সেল গঠন করা হবে।

৪. মন্ত্রী, এমপিসহ সকল জনপ্রতিনিধি ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের বাৎসরিক আয় ও সম্পদের হিসাব, সরকারি ব্যয় ও বরাদ্দের বিস্তারিত "হিসাব দাও" পোর্টালে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ ও হালনাগাদ করা হবে।

৫. আমলাতন্ত্রে ল্যাটেরাল এন্ট্রি বৃদ্ধি করা হবে এবং স্বাধীন পদোন্নতি কমিশনের মাধ্যমে সরকারি চাকরির শতভাগ পদোন্নতি হবে পার্ফরমেন্স-ভিত্তিক। পে-স্কেল মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতি তিন বছরে হালনাগাদ করা হবে এবং পে-স্কেলে ইমাম-মুয়াজ্জিন-খাদেমদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হবে।

৬. বিভিন্ন কার্ডের ঝামেলা ও জটিলতা দূর করতে এনআইডি কার্ডকেই সকল সেবা প্রাপ্তির জন্য ব্যবহার করা হবে।

৭. জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘণ্টায় ১০০ টাকা, বাধ্যতামূলক কর্ম-সুরক্ষা বীমা ও পেনশন নিশ্চিত করে শ্রম আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

৮. টিসিবির বিদ্যমান এক কোটি স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড ব্যবস্থাকে ট্রাকে লাইনে দাঁড়িয়ে নয়, বরং নিবন্ধিত মুদি দোকানে ব্যবহারযোগ্য করা হবে।

৯. সুনির্দিষ্ট বাড়িভাড়া কাঠামো তৈরি ও পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ/ ওয়াকফ সুকুক ভিত্তিতে সামাজিক আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলা হবে।

১০.গরীব ও মধ্যবিত্তের উপর করের বোঝা কমিয়ে, কর ফাঁকি বন্ধ করে কর-জিডিপি ১২%-এ উন্নীত করে শিক্ষা-স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ করা হবে ও ক্যাশলেস অর্থনীতি গড়ে তোলা হবে।

১১. পরিকল্পিতভাবে LDC উত্তরণের জন্য আগাম FTA–CEPA করা হবে। রপ্তানি বৈচিত্র্য ও নতুন শিল্প গড়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থিক খাত (ব্যাংকিং, ইন্সুরেন্স ও পুঁজিবাজারে) শৃঙ্খলা ফেরানো হবে। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ডেটাবেইস, কঠোর আইন, সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও রাজনৈতিক অধিকার প্রত্যাহার নিশ্চিত করা হবে।

১২.স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য ব্যবসার রাজনৈতিক ব্যয় শূন্যে নামাতে চাঁদাবাজি সম্পূর্ণ বন্ধ করা হবে, ৯৯৯-এর মতো হটলাইন চালু ও জিরো টলারেন্স নীতি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

১৩.মুদ্রাস্ফীতি ৬%-এ নামানো হবে; ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর অর্থনৈতিক ডেটা প্রকাশ বন্ধ করা হবে, রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্কুলভিত্তিক আর্থিক শিক্ষা চালু করে জনগণের সঞ্চয় ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা হবে।

১৪. ভোটাধিকারের বয়স হবে ১৬ এবং তরুণদের কণ্ঠকে প্রাতিষ্ঠানিক ও কার্যকর করতে Youth Civic Council গঠন করা হবে।

১৫. আগামী পাঁচ বছরে দেশে এক কোটি সম্মানজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। SME খাতে ক্যাশফ্লো-ভিত্তিক ঋণ, নারী ও যুব উদ্যোক্তাদের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার তহবিল, নিবন্ধন খরচ হ্রাস ও প্রথম ৫ বছরের করমুক্তি নিশ্চিত করা হবে।

১৬. সরকার-নিয়ন্ত্রিত প্লেসমেন্ট, ভাষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বছরে ১৫ লাখ নিরাপদ ও দক্ষ প্রবাসী কর্মী গড়ে তোলা হবে।

১৭. শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করে বিদ্যমান সকল ধরনের শিক্ষার মাধ্যম ও পদ্ধতিগুলোর একটি যৌক্তিক সমন্বয় করা হবে। শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন ও ৫ বছরে ৭৫% এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হবে।

১৮. উচ্চশিক্ষার সাথে কর্মক্ষেত্রের সংযোগ স্থাপন করতে স্নাতক পর্যায়ে ৬ মাসের পুর্ণকালীন ইন্টার্নশিপ/ থিসিস রিসার্চ বাধ্যতামূলক করা হবে।

১৯. প্রবাসী গবেষকদের সিনিয়রিটি ও ল্যাবের জন্য এককালীন ফান্ডিং দিয়ে রিভার্স ব্রেন ড্রেইন করা হবে। কম্পিউটেশনাল গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার জন্য একটি ন্যাশনাল কম্পিউটিং সার্ভার তৈরি করা হবে।

২০. হৃদরোগ, ক্যান্সার, ট্রমা, বন্ধ্যাত্ব ও জটিল অস্ত্রোপচারসহ জটিল ও দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসার জন্য দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা জোন (SHZ) গড়ে তোলার মাধ্যমে বিদেশে মেডিকেল ট্যুরিজমের বিকল্প তৈরি করা হবে।

২১. দেশের প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে সার্বজনীন জরুরি চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতের জন্য জিপিএস-ট্র্যাকড জাতীয় অ্যাম্বুলেন্স ও প্রি–হসপিটাল এমার্জেন্সি সিস্টেম গঠন করা হবে যেখানে এমার্জেন্সি প্যারামেডিক রেসপন্স টিম সংযুক্ত থাকবে। সকল বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে অত্যাধুনিক এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট গড়ে তোলা হবে। প্রতি জেলা হাসপাতালে অন্তত একটি অত্যাধুনিক সুবিধা সম্বলিত আইসিইউ ও সিসিইউ এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

২২. প্রত্যেক নাগরিকের জন্য এনআইডি ভিত্তিক ডিজিটাল হেলথ রেকর্ড এবং কার্যকর রেফারেল সিস্টেম গড়ে তোলা হবে। পর্যায়ক্রমে সকল নাগরিককে ন্যাশনাল হেলথ ইনস্যুরেন্সের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

২৩. নারীর ক্ষমতায়ন বাড়াতে নিম্নকক্ষে ১০০টি সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করবো যার সংখ্যা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সাথে সাথে হ্রাস করা হবে।

২৪. সকল প্রতিষ্ঠানে পূর্ণবেতনে ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ও ১ মাস পিতৃত্বকালীন ছুটি বাধ্যতামূলক করা হবে। সরকারি কর্মক্ষেত্রে ঐচ্ছিক পিরিয়ড লিভ চালু করা হবে এবং ডে-কেয়ার সুবিধা বাধ্যতামূলক করা হবে।

২৫. উপজেলা-ভিত্তিক বিকেন্দ্রীকৃত কাঠামোতে স্যানিটারি সামগ্রীসহ প্রয়োজনীয় নারীবান্ধব স্বাস্থ্যসামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। এই কর্মসূচির আওতায় উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সরকারি স্কুল ও কলেজে সরাসরি বরাদ্দ দেওয়া হবে।

২৬. একটি “ডায়াস্পোরা ডিজিটাল পোর্টাল” (ওয়ান-স্টপ সার্ভিস) গড়ে তোলা হবে, যেখানে পাসপোর্ট, এনআইডি, জন্মনিবন্ধন, কনস্যুলার সেবা, বিনিয়োগ ইত্যাদি সবকিছু অনলাইনে করা যাবে। বিমানবন্দর ও দূতাবাসে হয়রানি ও দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর মনিটরিং চালু করা হবে।

২৭. প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের পরিমাণের বিপরীতে বিনিয়োগ ও পেনশন সুবিধা এবং বিমানে RemitMiles নামে ট্রাভেল মাইলস প্রদান করা হবে।

২৮. প্রতিবন্ধী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, ভোটাধিকার, দক্ষতা উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

২৯. ঢাকা ও চট্টগ্রামে একক কর্তৃপক্ষের আওতায় সমন্বিত গণপরিবহন ব্যবস্থা করা হবে এবং মালবাহী ট্রেন বাড়িয়ে সড়কপথে ট্রাকের চাপ কমানো হবে।

৩০. দূষণকারী ইটভাটা বন্ধ, পরিচ্ছন্ন যানবাহন ও সবুজ প্রযুক্তি নিশ্চিত করা হবে। পাঁচ বছরে বিদ্যুতের অন্তত ২৫% নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদন ও সরকারি ক্রয়ে ৪০% ইলেকট্রিক ভেহিকল চালু করা হবে।

৩১. দেশের সকল শিল্পকারখানায় ইটিপি (ETP) স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হবে এবং এর ব্যয় কমাতে কর ও আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হবে। শিল্পদূষণ, নদী–খাল দখল ও পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করা হবে।

৩২. এনআইডি-ভিত্তিক যাচাইয়ের মাধ্যমে কৃষকের কাছে সরাসরি ক্যাশব্যাকের মাধ্যমে সার, বীজ ও যন্ত্রে ভর্তুকি দেওয়া হবে। কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বিক্রয় কেন্দ্র, মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজ ও ওয়্যারহাউজ স্থাপন করে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করা হবে।

৩৩. দেশীয় বীজ গবেষণা, সংরক্ষণ ও বিতরণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করে শুধু খাদ্য নিরাপত্তা নয়, খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা হবে। খাদ্য ভেজালবিরোধী অভিযান জোরদার করে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।

৩৪. ভারতের সাথে সীমান্ত হত্যা, আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানির ন্যায্য হিস্যা, শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী সন্ত্রাসীদের ফিরিয়ে আনা, অসম চুক্তিসহ সকল বিদ্যমান ইস্যুতে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সর্বোচ্চ পর্যায়ে দৃঢ় ভূমিকা নেয়া হবে এবং প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও আদালতে যাওয়া হবে।

৩৫. দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক কূটনীতির মাধ্যমে রোহিঙ্গা সংকট মানবিক সমাধান ও আসিয়ানে যুক্ত হয়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করা হবে।

৩৬. সশস্ত্র বাহিনীর জন্য রেগুলার ফোর্সের দ্বিগুন আকারের রিজার্ভ ফোর্স তৈরি করা হবে। পাঁচ বছরে সেনাবাহিনীতে একটি UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ব্রিগেড গঠন ও মাঝারি পাল্লার অন্তত আটটি সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল ব্যাটারি অধিগ্রহণ করা হবে।

Manifesto of Youth and Dignity

National Citizens Party (NCP)’s 36-Point

1. An independent commission will be formed to establish the implementation timeline and accountability framework for the July Charter provisions that depend on laws and administrative orders.
2. Exemplary justice will be ensured for all crimes against humanity committed during the era of Awami fascism, including the July massacre, Shapla Square massacre, BDR massacre, enforced disappearances, and extrajudicial killings, and a Truth and Reconciliation Commission will be established.
3. A special cell with the authority to conduct independent investigations will be created under the Human Rights Commission to prevent any discriminatory acts, persecution, or oppression based on religious hatred, communalism, minority oppression, or ethnic identity.
4. Annual income and asset statements of all ministers, MPs, elected representatives, and high-ranking government officials, as well as detailed records of government expenditure and allocations, will be clearly published and regularly updated on the “Hisaab Dao” (Accountability) portal.
5. Lateral entry into the bureaucracy will be increased, and 100% of government promotions will be performance-based through an independent Promotions Commission. Pay scales will be updated every three years to align with inflation, and the inclusion of imams, muazzins, and khadims in the pay scale will be ensured.
6. To eliminate the hassles and complexities of various cards, the NID card will be used for accessing all services.

7. The national minimum wage will be set at 100 Taka per hour, and labor laws will be strictly enforced to ensure mandatory work-safety insurance and pensions.
8. The existing 10 million Smart Family Card system of the TCB will be made usable at registered grocery stores, instead of requiring people to stand in line at trucks.
9. A clear rental structure will be established, and social housing projects will be developed on a public-private partnership and Waqf Sukuk basis.
10. The tax burden on the poor and middle class will be eased and tax evasion will be stopped to increase the tax-to-GDP ratio to 12%. This will allow investments in education and healthcare, and a cashless economy will be established.
11. For a systematic LDC graduation, advance FTAs and CEPAs will be negotiated. Export diversification and the development of new industries will create employment, and order will be restored in the financial sector (banking, insurance, and capital markets). A central database, strict laws, asset seizure, and withdrawal of political rights will be ensured against willful defaulters.
12. To eliminate political costs on businesses for both local and foreign investors, all forms of extortion will be completely eradicated through the introduction of a 999-style hotline and the strict enforcement of a zero-tolerance policy.
13. Inflation will be reduced to 6%; the publication of false and misleading economic data will be stopped. Full independence of regulatory institutions will be guaranteed, and school-based financial education will be introduced to safeguard the savings and future of the people.
14. The voting age will be 16, and a Youth Civic Council will be formed to institutionalize and amplify the voice of young people.
15. In the next five years, 10 million decent jobs will be created in the country. In the SME sector, cash-flow-based loans, a fund of 100 billion Taka for

women and youth entrepreneurs, reduced registration costs, and tax exemption for the first five years will be ensured.

16. Through government-regulated placement, language, and skills training, 1.5 million safe and skilled expatriate workers will be trained annually.
17. An Education Reform Commission will be formed to rationally coordinate all existing forms and systems of education. A separate salary structure for teachers will be implemented, and 75% of MPO-registered educational institutions will be nationalized within five years.
18. To link higher education with the career, a six-month full-time internship or thesis research will be made mandatory at the undergraduate level.
19. A reverse brain drain project will attract expatriate researchers through seniority and one-time funding for their labs. A national computing server will be established to give special emphasis to computational research.
20. To provide treatment for complex and incurable diseases, such as heart disease, cancer, trauma, infertility, and complicated surgeries, specialized healthcare zones (SHZ) will be established in the northern and southern regions of the country, creating a domestic alternative to overseas medical tourism.
21. To ensure universal emergency medical services in remote and hard-to-reach areas, a GPS-tracked National Ambulance & Pre-Hospital Emergency Care System with emergency paramedic response teams will be developed. State-of-the-art emergency departments will be established in all divisional and district-level hospitals. Each district hospital, we will ensure at least one modern ICU and CCU equipped with advanced facilities.
22. An NID-based digital health record system and an effective referral system will be established for every citizen. Gradually, all citizens will be brought under a National Health Insurance scheme.
23. To facilitate women's empowerment, 100 seats in the lower house will be reserved for female representatives through direct elections, and this

number will gradually decrease as women's participation in politics increases.

24. All institutions will provide 6 months of fully paid maternity leave and 1 month of paternity leave as mandatory. In government workplaces, optional "period leave" will be introduced, and daycare facilities will be made mandatory.
25. The supply of sanitary products and other essential women health items will be ensured through an upazila-based decentralized system. Under this program, direct allocations will be provided to upazila health complexes as well as government schools and colleges.
26. A "Diaspora Digital Portal" (one-stop service) will be created, where passport, NID, birth registration, consular services, investments, etc. can be done online. Strict monitoring will be implemented at airports and embassies to prevent harassment and abuse.
27. Based on the amount of remittances sent by expatriates, they will be offered investment and pension benefits, and "RemitMiles" travel miles for flights.
28. Education, health, employment, voting rights, skill development, and social protection for persons with disabilities and marginalized communities will be ensured.
29. In Dhaka and Chittagong, an integrated public transport system will be established under a single authority, and freight trains will be increased to reduce the burden of trucks on the roads.
30. Polluting brick kilns will be closed, clean vehicles and green technologies will be ensured. Within five years, at least 25% of electricity will be generated from renewable sources, and 40% of government procurement vehicles will be electric.
31. The installation of Effluent Treatment Plants (ETPs) will be made mandatory in all industrial facilities across the country, with tax and financial incentives provided to reduce associated costs. A zero-tolerance

policy will be enforced through strict legal action against industrial pollution, encroachment of rivers and canals, and environmental destruction.

32. Subsidies for fertilizer, seeds, and machinery will be provided to farmers through direct cashback using NID-based verification. Crop Sales Centres, multipurpose cold storage facilities, and warehouses will be established to ensure direct procurement of produce from farmers.
33. By strengthening domestic seed research, preservation, and distribution capacity, the government will ensure not only food security but also food sovereignty, while intensifying anti–food adulteration drives and enforcing strict penalties.
34. Regarding all existing issues with India, including border killings, Bangladesh’s fair share of water from international rivers, bringing back Sheikh Hasina and Awami League terrorists, and unequal bilateral agreements, we will take a firm stance at the highest diplomatic and political levels, and if necessary, pursue action through international organizations and courts.
35. Through bilateral and multilateral diplomacy, we will pursue a humanitarian solution to the Rohingya crisis and improve relations with Southeast Asian countries by joining ASEAN.
36. A reserve force twice the size of the conventional force will be created for the armed forces. Within five years, a UAV (Unmanned Aerial Vehicle) brigade will be formed in the Army, and at least eight medium-range surface-to-air missile batteries will be acquired.

১। নাগরিক অধিকার, নিরাপত্তা এবং ন্যায় বিচার

এই রাষ্ট্র কখনোই মানবিক ছিল না। শুধু গত সতেরো বছর নয় বা শুধু ৫৫ বছর নয়; বরং এই ভূখণ্ডে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়েই উঠেছে একটি ঔপনিবেশিক দর্শনের ওপর, যেখানে শাসন মানে ছিল নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা মানে ছিল ভয়, আর আইন মানে ছিল শাসকশ্রেণীর সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার একটি যন্ত্র। ব্রিটিশ কলোনিয়াল আমলে তৈরি প্রশাসন, পুলিশ, বিচারব্যবস্থা ও গোয়েন্দা কাঠামো কখনোই সাধারণ মানুষের সেবা দেওয়ার জন্য নির্মিত হয়নি। এগুলো তৈরি হয়েছিল জনগণকে শাসনের অধীন রাখতে, প্রতিরোধ দমন করতে এবং ক্ষমতাকে প্রশ্নাতীত করতে। এই কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার পর একের পর এক সরকার রাষ্ট্রকে পুনর্গঠন না করে বরং সেই নিপীড়নমূলক যন্ত্রকেই আরও শক্তিশালী করেছে। আওয়ামী ফ্যাসিবাদের আমলে এই ঐতিহাসিক সমস্যাটি চরম রূপ নেয়। গণহত্যা, গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্যাতন ও ভয় রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত হয়। ফলে রাষ্ট্র সাধারণ মানুষের চোখে নিরাপত্তার প্রতীক না থেকে আতঙ্কের উৎসে পরিণত হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার মানে শুধু নির্বাচন নয়, গণতন্ত্র মানে রাষ্ট্রকে আবার মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। তাই আমাদের লক্ষ্য কেবল ক্ষমতার পরিবর্তন নয়, বরং রাষ্ট্রের মানবিকীকরণ। সেখানে রাষ্ট্র আর শাসকের অস্ত্র থাকবে না, বরং মানুষের মর্যাদা, ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তার গ্যারান্টর হবে। এই প্রেক্ষাপটেই নিচের সংস্কার ও ন্যায়বিচারের নীতিমালা প্রস্তাব করা হচ্ছে।

- রাষ্ট্র পরিচালনার কাঠামোগত দুর্বলতা দূর করতে একটি স্বাধীন কমিশনের মাধ্যমে প্রণীত জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করা হবে। এই চার্টারে প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন, অর্থনীতি ও সেবাখাতের প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলোকে সময়সীমাবদ্ধ ও দায়বদ্ধ কাঠামোর মধ্যে আনা হবে। সংস্কার বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে জনসম্মুখে প্রকাশ করা হবে।
- নীতিনির্ধারণে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে গুরুত্ব দিয়ে উচ্চকক্ষে শিক্ষক, গবেষক, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, শ্রমিক প্রতিনিধি, প্রবাসীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার দক্ষ প্রতিনিধিদের মনোনয়ন দেওয়া হবে।
- জুলাইয়ে সংঘটিত গণহত্যা, শাপলা গণহত্যা, বিডিআর হত্যাকাণ্ড, গুম ও বিচারবহির্ভুত হত্যাসহ আওয়ামী ফ্যাসিবাদে সংঘটিত সকল মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার করা হবে।
- পোস্ট-নাজি জার্মানি ও পোস্ট-এপার্থাইড দক্ষিণ আফ্রিকার মডেলে ট্রুথ অ্যান্ড রিকন্সিলিয়েশন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রশাসন, বাহিনী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আওয়ামী সমর্থক এবং সহযোগীদের মধ্যে যারা ফৌজদারি অপরাধে যুক্ত নয়, তাদের অপরাধ ও সম্পৃক্ততার স্বীকার ও ক্ষমাপ্রার্থীতা সাপেক্ষে সোশাল জাস্টিসের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা হবে।
- বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বিচারবিভাগের সংস্কার বাস্তবায়ন, স্বাধীন বিচার বিভাগের আভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং মামলার দীর্ঘসূত্রিতা কমাতে আইনি কাঠামোর সংস্কার করা হবে।
- জমির খতিয়ান সম্পূর্ণ ডিজিটাল করা সম্পন্ন করা হবে। এতে ফৌজদারি মামলার জট কমে যাবে এবং দখলিত্তিক মালিকানা সম্পূর্ণ বন্ধ হবে।

- নিজের নির্বাচনী এলাকার বাইরে কর্মরত বেসরকারি চাকরিজীবী ও শিক্ষার্থী, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ, ও অসুস্থ ব্যক্তিসহ আরও বেশি মানুষকে নির্দিষ্ট ফি এর বিনিময়ে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। সামাজিক সুরক্ষার আওয়তায় থাকা মানুষদের জন্য ফি শূন্য/নামেমাত্র হবে।
- গ্রাম পার্লামেন্টের মাধ্যমে গ্রাম সরকার ব্যবস্থাকে পুনঃবাস্তবায়ন করা হবে।
- ধর্মবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, সংখ্যালঘু নিপীড়ন এবং জাতি-পরিচয়ের কারণে যেকোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ, নির্যাতন ও নিপীড়নকে প্রতিহত করতে স্বাধীন তদন্তের এখতিয়ার-সম্পন্ন মানবাধিকার কমিশনের একটি বিশেষ সেল গঠন করা হবে।

মানবতাবিরোধী অপরাধে সংশ্লিষ্টতার প্রেক্ষিতে র‍্যাব বিলুপ্ত করা হবে এবং ডিজিএফআইকে পুনর্গঠন করা হবে। র‍্যাবের বিকল্প হিসেবে পুলিশের মধ্যেই একটি আধুনিক, দক্ষ এলিট ফোর্স গঠন করা হবে (gendarmerie মডেলে)। একই সঙ্গে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে রক্ষা করতে একটি সুস্পষ্ট আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা হবে। গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির গোয়েন্দা সংস্থার কার্যক্রমে নিয়মিত তদারকি করার ব্যবস্থা রাখা হবে।

পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুলিশকে একটি পেশাদার সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলা হবে। আমরা ঔপনিবেশিক আমলের ১৮৬১ ও ১৮৯৮ সালের পুলিশ আইন যুগোপযোগী করবো। যেকোনো গ্রেফতারের ক্ষেত্রে ওয়ারেন্ট বা সুস্পষ্ট কারণের উল্লেখ থাকতে হবে, গ্রেফতারকারী পুলিশের পদবি ও পরিচয় স্পষ্টভাবে জানাতে হবে, এবং সুস্পষ্ট পেশাগত প্রয়োজন ব্যতীত সকল পুলিশকে দায়িত্বরত অবস্থায় ইউনিফর্ম পরতে হবে।

প্রতিটি পুলিশি অভিযানে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সকল দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যকে ধাপে ধাপে বডি ক্যামেরার আওতায় আনা হবে এবং পুলিশের সকল টহল ও অভিযানে ব্যবহৃত যানবাহনে জিপিএস ও ড্যাশক্যাম স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হবে। ইতোমধ্যে সরকার থেকে নির্বাচন উপলক্ষ্যে ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা কেনার হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা: ৫ বছরে সারাদেশের সব টহল পুলিশ ও সব গাড়ি

বাজেট: ৫ বছরে ১০০০ কোটি টাকা (এককালীন ৮০০ কোটি)

উচ্চ-ঝুঁকির আসামীদের জামিনে মুক্তি পেলে তাদের চলাচল সীমিত করার জন্য আমরা জিপিএস-সক্ষম ইলেকট্রনিক ব্রেসলেটের ব্যবহার চালু করব। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আসামিদের সার্বক্ষণিক নজরদারি করা হবে, নির্দিষ্ট এলাকা ও সময়ের বাইরে চলাচল সীমিত থাকবে, এবং ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। ব্রেসলেটের মাধ্যমে জামিনভঙ্গ বা পালানোর ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে, যা বিচারপ্রক্রিয়ার কার্যকারিতা বাড়াবে এবং সমাজে নিরাপত্তা ও বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে।

লক্ষ্যমাত্রা: ১০০০ টি ট্র্যাকিং ডিভাইস

বাজেট: এককালীন খরচ ২৫ কোটি টাকা, বাৎসরিক খরচ ২০ কোটি টাকা

পার্বত্য অঞ্চল: অংশগ্রহণমূলক ও মানবিক রাষ্ট্রচর্চা

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নীতির মধ্যে মানুষের মতামত ও অধিকার উপেক্ষিত থেকেছে। রাষ্ট্রের পুনঃমানবিকীকরণের অংশ হিসেবে পার্বত্য অঞ্চলে অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বাধ্যতামূলক নীতিতে রূপান্তর করা হবে। এজন্য পার্বত্য অঞ্চলে সকল বড় অবকাঠামো, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণের আগে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, জনপ্রতিনিধি ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোর পূর্বানুমোদিত ও অবহিত মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হবে। পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের আইনগত ক্ষমতা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাদের ভূমিকা কার্যকর করা হবে। ভূমি, বন ও জীবিকাসংশ্লিষ্ট প্রকল্পে জোরপূর্বক বাস্তবায়নের পরিবর্তে সম্মতি-ভিত্তিক উন্নয়ন (consent-based development) নীতি অনুসরণ করা হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার, প্রবেশগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার, মর্যাদা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ সংস্কার করে একটি স্বায়ত্তশাসিত অ্যাক্সেসিবিলিটি এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই সংস্থার কাজ হবে ভবন, গণপরিবহন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসহ সকল জনসাধারণের স্থানে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা হবে এবং তাদের শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক সেবা ও কর্মসংস্থানে কার্যকর অন্তর্ভুক্তি গড়ে তোলা হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বাস্তবায়নে পোস্টাল ভোট ও সহায়ক পদ্ধতিতে ভোটদানের সুযোগ সম্প্রসারণ করা হবে এবং সব ভোটকেন্দ্রে র‍্যাম্প, সহায়ক বুথ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করা হবে। ভোটার ও প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনি ও প্রশাসনিক বাধা দূর করে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রতিবন্ধীবান্ধব করা হবে। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার লক্ষ্যে বাজারচাহিদাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন ও পেশাগত প্রশিক্ষণ চালু করা হবে। কারিগরি, আইটি ও ডিজিটাল স্কিল, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও স্বনিযুক্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকরিমুখী সুযোগ সৃষ্টি করা হবে এবং প্রশিক্ষণ ও কর্মস্থলে অ্যাক্সেসিবিলিটি নিশ্চিত করা হবে। সামাজিক সুরক্ষার আওতায় প্রতিবন্ধী ভাতা মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হবে। সকল পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম গঠন করা হবে, যা নীতি প্রণয়ন, সমন্বয় ও তদারকিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে।

২। দূর্নীতিমুক্ত নাগরিক সেবা নিশ্চিতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা এবং আধুনিকায়ন

মন্ত্রী, এমপিসহ সকল জনপ্রতিনিধি ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের বাৎসরিক আয় ও সম্পদের হিসাব, সরকারি ব্যয় ও বরাদ্দের বিস্তারিত "হিসাব দাও" পোর্টালে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ ও হালনাগাদ করা হবে। জনগণ যে কোনো সময় এই তথ্য দেখতে পারবে ফলে জবাবদিহিতা থাকবে। প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় বড় বিলবোর্ডে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট খরচের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ রাখতে হবে। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে বাজেট ও বরাদ্দের বিষয়ে গণশুনানি আয়োজন করা হবে, যাতে নাগরিকরা সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে, বাজেটের অদক্ষতা এবং অনিয়ম সনাক্ত করা যায়, এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলো জনগণের কাছে স্বচ্ছ হয়। এই তথ্যগুলোও 'হিসাব দাও' পোর্টালে থাকবে। সরকার পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বাজেট ও বরাদ্দের বিষয়ে গণশুনানি আয়োজন করা হবে। আমরা আমাদের হিসাব দাও অ্যাপে 'অভিযোগ ও পরামর্শ' বিভাগ চালু করব। এই অংশে চাঁদাবাজি, দুর্নীতি বা অন্য যে কোনো প্রমাণসহ অভিযোগ গ্রহন করা হবে। এছাড়া, এখানে থাকবে কোন সংস্থা বা দফতর কোন কাজের জন্য কত ভাড়া বা অনুমোদন নিয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য, যাতে নাগরিকদের অতিরিক্ত অর্থ দিতে না হয় বা চাঁদাবাজির সম্মুখীন হতে না হয়। আমরা নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করব। ইজারাদারদের সেন্ট্রাল ভেরিফিকেশনের আওতায় আনা হবে। ইজারা গ্রহণের সময় কিউআর কোড সাথে রাখতে হবে যা স্ক্যান করে ইজারার সত্যতা ও পরিমাণ ওয়েবসাইটে ভেরিফাই করা যাবে।

নাগরিকদের জন্য বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বর্তমানে আলাদা আলাদা কার্ড, সার্টিফিকেট এবং সনদের প্রয়োজন হয়, যা সময়সাপেক্ষ এবং জটিল। এই অসুবিধা দূর করতে আমরা আন্তর্জাতিক স্টান্ডার্ড মেনে এনআইডি কার্ডকেই সকল সরকারি ও আধা-সরকারি সেবা প্রাপ্তির একক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করছি। এজন্য এনআইডি সিস্টেমকে নির্বাচন কমিশন থেকে পৃথক করা হবে এবং সকল বয়সীদের দেয়া হবে, যাতে এটি কেবল নাগরিক সনদ ও সেবার জন্য ব্যবহার করা যায়। পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যাংকিং, ট্যাক্স, সম্পদ রেজিস্ট্রি, সরকারি সনদ, সামাজিক নিরাপত্তা, ভাতা এবং অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধার জন্য এনআইডিকে একক ডিজিটাল আইডি হিসেবে ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। বিদ্যমান বিভিন্ন সরকারি ডেটাবেজের সাথে এনআইডি সংযুক্ত করে লিংকিং এবং ইন্টারঅপারেবিলিটি তৈরি করা হবে, যাতে তথ্যের পুনরাবৃত্তি বা অসঙ্গতি না থাকে। এতে সেবা প্রক্রিয়া সহজ, দ্রুত ও স্বচ্ছ হবে, অনিয়ম ও জালিয়াতি রোধ হবে এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর হবে। একই সময়ে নাগরিকরা অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে তাদের এনআইডির তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে এবং পারবে এবং এ সংক্রান্ত সকল সেবা গ্রহণ করা আরও দ্রুত ও সহজ হবে। যদিও এখন পর্যন্ত বিভিন্ন উদ্যোগ থাকলেও আমলাতান্ত্রিক বাধার কারণে তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি, আমরা জনগণের সেবা ও অধিকারকে আমলাতন্ত্রের স্বার্থের কাছে জিম্মি হতে দেবো না।

নাগরিকদের অফিসে আসার প্রয়োজনীয়তা কমাতে সরকারি সেবা প্রাপ্তি হবে যথাসম্ভব ডিজিটাল। অনলাইন আবেদন, যাচাই এবং ফলাফল প্রাপ্তি সহজ হবে এবং সেবা গ্রহণের সময় ও খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। প্রতিটি সরকারি

কর্মকর্তাকে অফিসিয়াল ইমেইল প্রদান করা হবে এবং সমস্ত সরকারি যোগাযোগ বাধ্যতামূলকভাবে ডিজিটাল মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। এর ফলে প্রশাসনিক কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে, তথ্যের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং মানুষের সময় ও শ্রম বাঁচবে। নাগরিক ও সরকারি তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে সরকার-মালিকানাধীন ডেটা সেন্টার এবং স্থানীয় আইটি অবকাঠামো শক্তিশালী করা হবে। দেশের তথ্য সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ এবং নিয়ন্ত্রণাধীন করার জন্য বিদেশি সার্ভার এবং আন্তর্জাতিক টেরেস্ট্রিয়াল কেবলের উপর নির্ভরতা ধাপে ধাপে হ্রাস করা হবে। সরকারি ওয়েবসাইটগুলো আধুনিকীকরণ করা হবে এবং পেপারলেস প্রশাসন বাস্তবায়ন করা হবে, যাতে সকল আবেদন, অনুমোদন এবং রিপোর্টিং অনলাইনে সম্পন্ন করা যায় এবং আবেদনের ট্র্যাকিং নিশ্চিত করা যায়। সেবাগ্রহীতাদের সাথে দুর্ব্যবহার ও হয়রানি বন্ধ করতে কঠোর মনিটরিং এর আওতায় আনা হবে।

সরকারি প্রশাসনকে দক্ষ, সৎ ও জনগণকেন্দ্রিক করতে সরকারি চাকরির বেতন কাঠামো (পে স্কেল) বাজার বাস্তবতা ও মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতি তিন বছরে হালনাগাদ করা হবে। একটি স্বচ্ছ ইনডেক্সেশন ফর্মুলার মাধ্যমে জীবনযাত্রার ব্যয়, বেসরকারি খাতের বেতন কাঠামো ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিবেচনায় নিয়ে এই সমন্বয় কার্যকর করা হবে। এতে সরকারি কর্মচারীরা ন্যায্য আয় পাবেন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য অনৈতিক পথ বেছে নেওয়ার প্রণোদনা কমবে। পে-স্কেলে সরকারি ও মডেল মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম ও কর্মীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হবে। সরকারি চাকরিতে পদোন্নতি হবে সম্পূর্ণরূপে পারফরমেন্সভিত্তিক। জ্যেষ্ঠতা নয়, বরং নির্ধারিত কর্মদক্ষতা সূচক (KPI), সততা রেকর্ড, প্রশিক্ষণ অর্জন ও সেবা প্রদানের মান পদোন্নতির মূল মানদণ্ড হবে। পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে একটি স্বাধীন পদোন্নতি কমিশন গঠন করা হবে। এই কমিশন সকল ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদোন্নতির তদারকি করবে। এর ফলে নেপোটিজম, লবিং বা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ বন্ধ হবে। প্রশাসনে দক্ষতা ও বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা আনতে ল্যাটেরাল এন্ট্রি ব্যবস্থাকে পরিকল্পিতভাবে সম্প্রসারিত করা হবে। বিশেষ করে অর্থনীতি, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, অবকাঠামো ও নীতি বিশ্লেষণ খাতে গুরুত্ব দেয়া হবে। তবে ল্যাটেরাল এন্ট্রির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নিয়োগ বা স্বজনপ্রীতির সম্ভাবনা রোধে প্রতিটি পদের জন্য স্বাধীন কর্ম কমিশনের মাধ্যমে স্পষ্ট যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার নীতিমালা নির্ধারণ করার মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে উন্মুক্ত, প্রতিযোগিতামূলক ও যাচাইযোগ্য রাখা হবে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার খাতে নিয়োগের জন্য আলাদা পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা হবে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর লড়াই নিশ্চিত করতে সরকার দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-কে সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থিক ও আইনি সহায়তা প্রদান করবে। এই লক্ষ্যে দুদকের বাজেট ও জনবল উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার, আধুনিক তদন্ত প্রযুক্তি সরবরাহ, ফরেনসিক অডিট, ডিজিটাল ট্র্যাকিং, মানি লন্ডারিং তদন্ত এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ে উন্নত ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। একই সঙ্গে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত করতে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো ও প্রক্রিয়াগত সংস্কার করা হবে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনায় দ্রুত, নিরপেক্ষ ও কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শাস্তিপ্রাপ্ত দুর্নীতিবাজদের জন্য ভবিষ্যতে সরকারি চাকরি, রাষ্ট্রীয় প্রকল্প, সরকারি ঠিকাদারি বা পরামর্শক হিসেবে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে স্থায়ী বা নির্দিষ্ট সময়ের

নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। হুইসেলব্লোয়ার সুরক্ষা আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয় সংস্কার করে নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের তথ্য প্রদান উৎসাহিত করা হবে।

দুর্নীতি দমনকে বাস্তব অর্থে শক্তিশালী করতে দুদককে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে স্টিং অপারেশন, অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনায় অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়া হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামোর সংশোধন করা হবে। তাছাড়া দুদকের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটিতে তাদের বার্ষিক রিপোর্টের উপর শুনানি চালু করা হবে।

নাগরিক সেবা কেন্দ্রের বিস্তার

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জনগণের কাছে সেবা পৌঁছে দিতে কয়েকটি নাগরিক সেবা কেন্দ্র খুলেছে। এসব কেন্দ্রে সরাসরি যেয়ে নাগরিকগণ বিভিন্ন সেবা পেতে পারেন এবং বিনিময়ে সেবাকেন্দ্রের উদ্যোক্তাদের ফি প্রদান করেন। এই ধারণাকে আমরা দ্রুত সারাদেশে পৌঁছে দিতে বেসরকারি খাতের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরে দেশব্যাপী দুই হাজারটি নাগরিক কর্নার স্থাপন করবো। এর ফলে একদিকে সরকারের পরিচালন ব্যয় ও প্রশাসনিক বোঝা কমবে, সাধারণ মানুষ দ্রুত ও হয়রানিমুক্ত সেবা পাবে, এবং বহু তরুণের কর্মসংস্থান হবে।

সরকার প্রতিটি সেবার জন্য একটি সর্বোচ্চ মূল্যসীমা (Price Ceiling) নির্ধারণ করে দেবে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত একাধিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ডিস্ট্রিবিউশন পার্টনার সেবা প্রদানের সুযোগ পাবে। গ্রাহক আকৃষ্ট করতে এই প্রতিষ্ঠানগুলো সেবার মান বৃদ্ধি এবং নির্ধারিত সীমার মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য প্রস্তাব করতে পারবে। ফলে জনগণ কম খরচে উন্নত সেবা পাবে। বাজার যাতে কোনো নির্দিষ্ট বড় কোম্পানি বা সিন্ডিকেটের দখলে না যায়, সেজন্য আমরা কঠোর 'এন্টি-মনোপলি' নীতি প্রয়োগ করব। কোনো একক কোম্পানি বা মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি (যেমন মোট কর্নারের ৫%-এর বেশি) শাখা খুলতে পারবে না। এতে নতুন ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এই খাতে আসার সুযোগ পাবেন এবং সত্যিকারের প্রতিযোগিতা বজায় থাকবে। সেবাকেন্দ্রে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় তরুণ ও নারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

প্রথম ধাপে ২ বছরে দেশের সব উপজেলা ও সব সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে প্রায় এক হাজারটি সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এর পরে জনসংখ্যা ঘনত্ব ও দূরত্ব বিবেচনায় সেবাকেন্দ্রের সংখ্যা দ্বিগুণ করা হবে। এই ব্যবস্থার সাফল্য ও গ্রহণযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে এবং যথাযথ ডেটা সিকিউরিটি প্রোটোকলের অধীনে বায়োমেট্রিক ডেটা সম্পন্ন বিভিন্ন সেবাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তখন প্রতিটি নাগরিক কর্নার সরকারের কেন্দ্রীয় ডেটাবেসের সাথে সুরক্ষিত ভিপিএন (VPN) বা এপিআই (API) এর মাধ্যমে যুক্ত থাকবে। বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন এবং ডিজিটাল অডিট ট্রেইলের মাধ্যমে প্রতিটি কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে, যাতে জালিয়াতির কোনো সুযোগ না থাকে।

৩। দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

টিসিবি থেকে ইতোমধ্যে বিতরণ করা এক কোটি “স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড” সিস্টেম আছে। ফলে আমরা নতুন কোন কার্ড করবো না, বরং এই কার্ডকেই যথযথভাবে এনআইডি লিংক করবো। বর্তমানে লাইনে দাড়িয়ে টিসিবির ট্রাক থেকে পণ্য নেয়া একটি অমানবিক ব্যবস্থা। আমরা সারাদেশে এই সুবিধাভোগকারীদের ঘনত্ব বিবেচনায় স্থায়ী ডিলারশিপ এবং বিদ্যমান মুদি দোকানের সাথে পার্টনারশিপ গড়ে তুলবো। টিসিবির ডিলারশিপ বা সিস্টেমে নিবন্ধিত দোকান থেকে পণ্য কেনার সময় স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য (যেমন চাল, ডাল, আলু, ভোজ্য তেল, ও ডিম) বাজারমূল্য থেকে ২৫-৩০% ছাড় পাওয়া যাবে। এই আগের মতোই এই কার্ডেও মাসিক লিমিট দেয়া থাকবে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যপণ্যকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে পাঁচ বছরের জন্য ভ্যাটমুক্ত ও আমদানি শুল্কমুক্ত (VAT-free, Duty-free) ঘোষণা করা হবে। এই নীতির ফলে প্রতি বছর বাজেটকে কেন্দ্র করে এসব পণ্যের দামের কৃত্রিম ওঠানামা ও বাজারে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হবে না। দীর্ঘমেয়াদি করনীতির মাধ্যমে আমদানিকারক, উৎপাদক ও সরবরাহকারীরা আগাম পরিকল্পনা করতে পারবে। ফলে বাজারে মূল্যের পূর্বানুমানযোগ্যতা (predictability) বৃদ্ধি পাবে এবং ভোক্তারা স্থিতিশীল দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য ক্রয় করতে সক্ষম হবে। এটি বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই তালিকাভুক্ত পণ্যসমূহ নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে এবং দেশে উৎপাদন, সরবরাহ পরিস্থিতি ও খাদ্য নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী হালনাগাদ করা হবে। একই সঙ্গে করছাড়ের সুফল যেন ভোক্তা পর্যায়ে প্রতিফলিত হয়, সে জন্য বাজার তদারকি, প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণ এবং সিন্ডিকেট ও মজুদদারির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম অর্থবছরের বাজেটে আমাদের উদ্দেশ্য মাসিক ৭০ হাজার টাকার নিচে আয় করা সবার আয়কর কমানো ও ১ লাখ টাকা পর্যন্ত আয়কর প্রায় অপরিবর্তিত রাখা। মাসে ৩৫ হাজার টাকার নিচের আয় করমুক্ত করা হবে যা মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় করে পাঁচ বছরে প্রায় মাসিক ৫০ হাজারে উন্নীত হবে। এর ফলে প্রায় ৯৫% মানুষের জন্য কর কমবে বা অপরিবর্তিত থাকবে। বর্তমানে করের বোঝা চাকরিজীবী মধ্যবিত্তের উপর; এই পরিবর্তনে সেই বোঝা কমবে। কর রাজস্ব আয় বজায় রাখতে করনেট সম্প্রসারণ এবং ধনীদের ন্যায্য ট্যাক্সের আওতায় আনার উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। অন্যান্য ট্যাক্স স্ল্যাবগুলোও প্রতি বছরে মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় করা হবে। দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের মৌলিক প্রয়োজনের উপর ভ্যাটের চাপ কমাতে প্রতি এনআইডি-টিআইএন এর বিপরীতে মাসিক ফোন ও বিদ্যুৎ বিলে একটি করমুক্ত সীমা বসানো হবে। কিন্তু সুবিধা পেতে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দিতে হবে। এর পাশাপাশি সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ন্যাশনাল হেলথ ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়াম নির্ভর করবে পরিবারের আয়ের উপর। ফলে এসব কর্মসূচি ট্যাক্স সিস্টেমে রেজিস্টার হওয়া এবং আয় ডিক্লারেশনের একটি ইন্সেন্সটিভ হিসেবে কাজ করবে।

নিচের টেবিলে বর্তমান আয়করের সাথে আমাদের প্রথম বছরের প্রস্তাবিত আয়কর ব্যবস্থা দেখানো হলো। হাউজহোল্ড আয়ের ভিত্তিতে আমাদের সিমুলেশন অনুসারে এতে মোট আয়কর রাজস্ব কমবে না। আমরা ট্যাক্স রেট অধিক বাড়িয়ে

নয়, বরং ট্যাক্স নেট বাড়িয়ে আয়কর রাজস্ব বৃদ্ধি করতে চাই। আমাদের এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থাতে মাসিক ১.১ লাখ থেকে ২.৫ লাখ আয় করা ব্যক্তিদের ইফেক্টিভ আয়কর বাড়বে ০.৫ থেকে ১ শতাংশেরও কম। বাকিদের জন্যও আয়কর বৃদ্ধি ২ শতাংশের কম হবে। আরও নিখুঁত সিমুলেশনের জন্য NBR থেকে করদাতাদের আয়ের ডিস্ট্রিবিউশন দরকার হবে।

কর শতাংশ	বর্তমান স্ল্যাব (বাৎসরিক আয়)	এনসিপির প্রস্তাবিত (বাৎসরিক আয়)
০	প্রথম ০ - ৩.৫ লাখ	প্রথম ০ - ৪.২ লাখ
৫	পরবর্তী ১ লাখ	পরবর্তী ১.৩ লাখ
১০	পরবর্তী ৪ লাখ	পরবর্তী ১.৫ লাখ
১৫	পরবর্তী ৫ লাখ	পরবর্তী ৫ লাখ
২০	পরবর্তী ৫ লাখ	পরবর্তী ৫ লাখ
২৫	পরবর্তী ২০ লাখ	পরবর্তী ৫ লাখ
৩০	৩৮.৫ লাখের উর্ধ্বে আয়	২৭ লাখের উর্ধ্বে আয়

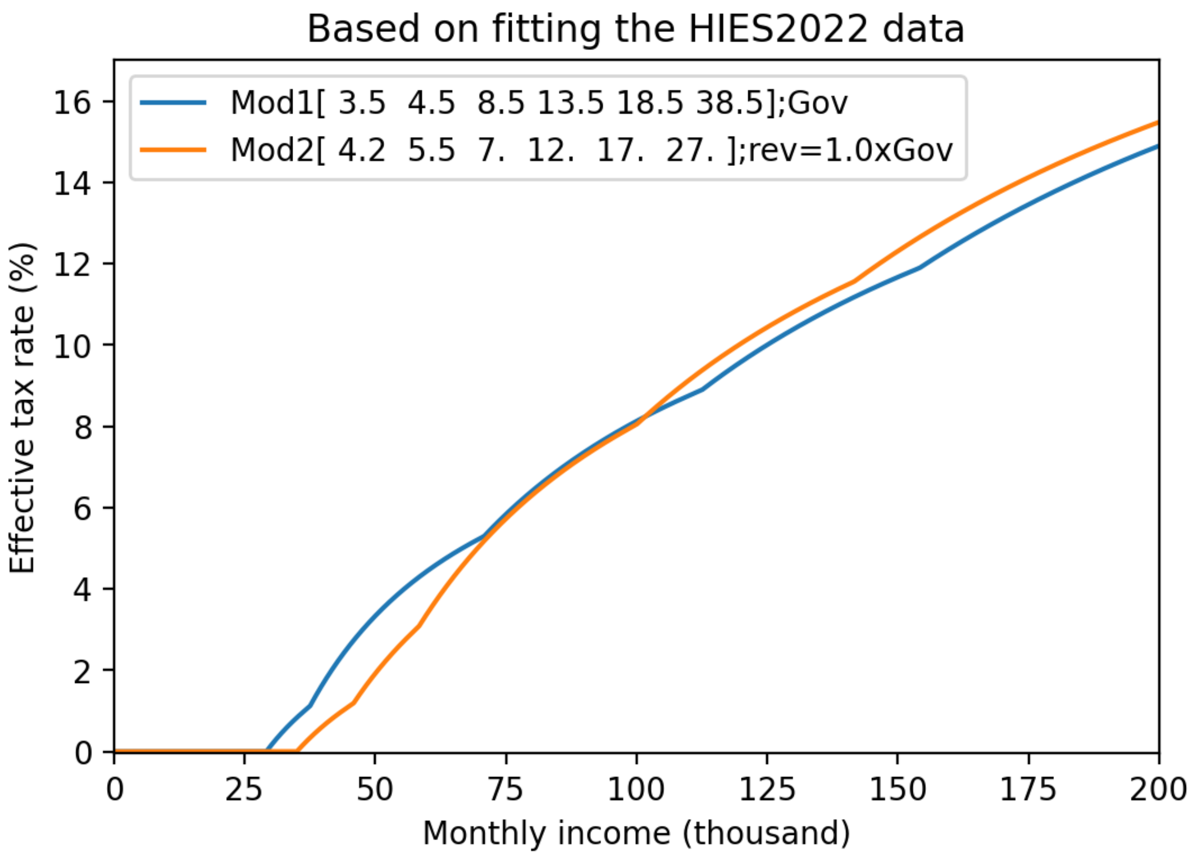

দিনমজুর, চা শ্রমিক, গৃহকর্মী, নির্মাণকর্মী, পরিবহন কর্মীসহ সকল নিম্নআয়ের শ্রমিকের অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আমরা একটি সমন্বিত ন্যূনতম মজুরি কাঠামো তৈরি করা হবে। এই লক্ষ্যে প্রথম বছরে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি হবে ঘণ্টায় ১০০ টাকা এবং শিক্ষানবিশের জন্য ৬০ টাকা। মজুরি কাঠামোতে বড় শহর ও অঞ্চলভিত্তিক মজুরি বেশি হবে এবং প্রতি বছর মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় করা হবে। তাছাড়া সেক্টরভিত্তিক এর অতিরিক্ত মজুরি নেগোশিয়েট করার সুযোগ বজায় থাকবে। এতে করে বিভিন্ন খাতে, যেমন চা-শ্রমিকদের উপর শোষণ বন্ধ হবে। চা-শ্রমিকদের বাসস্থান, চিকিৎসা সহ বিভিন্ন সুবিধার অজুহাতে নামেমাত্র মজুরি দেয়া হয়। ন্যূনতম মজুরি কাঠামোর আওতায় তারা সেসব সুবিধার জন্য আয় থেকে দাম দেয়ার স্বাধীনতা অর্জন করবেন। এছাড়া শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক কর্ম-সুরক্ষা বীমা কার্যকর করা হবে এবং বিদ্যমান শ্রম আইন সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। সেই লক্ষ্যে শ্রম আদালতের ব্যপ্তি এবং এক্সেসিবিলিটি বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দেয়া হবে।

সবার জন্য সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাধ্যতামূলক করা হবে। তবে প্রিমিয়াম পরিশোধের হার নাগরিকের আয়ভিত্তিক হবে। এই স্কিমের আওতায় সকল অংশগ্রহণকারীর জন্য স্বাস্থ্যবিমা সুবিধাও নিশ্চিত করা হবে। বর্তমানে দেশে কেবল কনভেনশনাল (সুদভিত্তিক) পদ্ধতিতে সর্বজনীন পেনশন পরিকল্পনা চালু রয়েছে। সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাকে সত্যিকার অর্থে অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে আমরা কনভেনশনাল পদ্ধতির পাশাপাশি ইসলামিক (শরিয়াহ-সম্মত) পেনশন স্কিম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করব। এই দুই পদ্ধতিতে পেনশন স্কিম চালুর মাধ্যমে জনগণ নিজের বিশ্বাস, পছন্দ ও আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। ইসলামিক পেনশন ব্যবস্থায় মুনাফাভিত্তিক, ঝুঁকি ভাগাভাগির নীতি অনুসরণ করে সম্পূর্ণ শরিয়াহ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে তহবিল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে। সরকারের পেনশন ব্যবস্থার প্রতি জনগণের সচেতনতা ও আস্থা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, সহজ ভাষায় তথ্য প্রদান, ডিজিটাল ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নিবন্ধন ব্যবস্থা এবং স্বচ্ছ তহবিল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে। নিয়মিত অডিট, পাবলিক রিপোর্টিং ও জবাবদিহিমূলক কাঠামোর মাধ্যমে জনগণের বিশ্বাস আরও দৃঢ় করা হবে। বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শ্রমজীবী মানুষদের এই পেনশন ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে। তাদের জন্য স্বল্প অঙ্কের কিস্তি, নমনীয় পরিশোধ ব্যবস্থা এবং সরকারের পক্ষ থেকে প্রণোদনা বা আংশিক ভর্তুকি প্রদান করা হবে।

দলিত-হরিজন-তফসিলি সম্প্রদায়সহ সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের বিকাশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তায় আমরা বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করব। বিশেষ বৃত্তি, উপবৃত্তি, আবাসিক সুবিধা, কোচিং ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হবে, যাতে দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্য শিক্ষা গ্রহণে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বসবাসকারী এলাকাগুলোতে কমিউনিটি ক্লিনিক, মোবাইল স্বাস্থ্যসেবা ও বিশেষায়িত চিকিৎসা সুবিধা জোরদার করা হবে। মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করে একটি সুস্থ ও কর্মক্ষম প্রজন্ম গড়ে তোলা হবে। কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে, সরকারি ও বেসরকারি খাতে ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, সহজ শর্তে ঋণ, উদ্যোক্তা সহায়তা এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। ঐতিহ্যবাহী পেশাগুলোর আধুনিকায়ন ও বাজার সংযোগ নিশ্চিত করে টেকসই আয়ের পথ তৈরি করা হবে। সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিতকরণে, ভাতা, আবাসন, খাদ্যনিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর করা হবে। একই সঙ্গে সব ধরনের

সামাজিক বৈষম্য, বঞ্চনা ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আইনগত সুরক্ষা ও কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করে সমান অধিকার ও মানবিক মর্যাদার সমাজ গড়ে তোলা হবে।

বর্তমানে ঢাকাবাসীরা তাদের আয়ের ৪০-৬০%-ই ব্যয় করতে বাধ্য হন বাড়িভাড়ার পেছনে। গত ২৫ বছরে ঢাকায় বাসা ভাড়া হয়েছে প্রায় ৫ গুন। শহরাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ কমাতে এবং আবাসন বাজারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে আমরা এলাকাভিত্তিক বাড়িভাড়া কাঠামো প্রণয়ন করব। শহরের ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ সুবিধা, নাগরিক সেবা, অবকাঠামো, ভবনের ধরন ও আয়তন বিবেচনায় নিয়ে একটি ন্যায্য ও বাস্তবসম্মত ভাড়া নির্ধারণ পদ্ধতি চালু করা হবে। প্রতি বছর ভাড়া বৃদ্ধির জন্য সুস্পষ্ট, সীমাবদ্ধ ও আইনগত নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে, যাতে বাড়িওয়ালারা ইচ্ছামতো বা হঠাৎ করে অযৌক্তিক হারে ভাড়া বাড়াতে না পারে। ভাড়া বৃদ্ধির হার মুদ্রাস্ফীতি, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করা হবে। ভাড়াটিয়াদের অধিকার সুরক্ষায় লিখিত ভাড়া চুক্তি বাধ্যতামূলক করা হবে এবং ভাড়া সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সহজ, দ্রুত ও স্বচ্ছ অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু করা হবে। একই সঙ্গে বাড়িওয়ালাদের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষাও নিশ্চিত করা হবে, যাতে আবাসন খাতে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত না হয়।

শহরে সামাজিক আবাসন ব্যবস্থা

অপরিকল্পিত নগরায়ন, জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, আকাশচুম্বী বাড়িভাড়া, অসহনীয় যানজট এবং দূষণ নগরবাসীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। আমরা মনে করি সকলের জন্য মর্যাদাপূর্ণ, নিরাপদ আবাসন এবং একটি সুস্থ কমিউনিটি জীবন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। ঢাকার আবাসন সংকটের সমাধান বিকেন্দ্রীকরণ এবং ঢাকার উপকণ্ঠে স্বয়ংসম্পূর্ণ উপশহর গড়ে তোলা। পাইলট প্রকল্পের জন্য আমরা ঢাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (DAP 2022-2035) এবং পরিবহন অবকাঠামোর বিশ্লেষণ করে তিনটি সম্ভাব্য স্থান হেমায়েতপুর-সাভার করিডোর এবং কেরানীগঞ্জ-কালাকান্দি সংলগ্ন এলাকা। হেমায়েতপুরে প্রস্তাবিত এমআরটি লাইন-৫ এবং সাভারের বিশাল শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে এবং কেরানীগঞ্জে পদ্মা সেতু সংযোগ সড়ক ও বুড়িগঙ্গার তীরের অব্যবহৃত সরকারি জমি কাজে লাগিয়ে এই এলাকাগুলোতে 'ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট' (TOD) বা গণপরিবহন কেন্দ্রিক আবাসন গড়ে তোলা হবে। ঢাকার মূল কেন্দ্র থেকে দূরত্ব হবে মাত্র ৩০-৪০ মিনিট।

আবাসন খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে এবং সরকারি অর্থের ওপর চাপ কমাতে "ইনসেনটিভ জোনিং ও ক্রস-সাবসিডি" অর্থায়ন মডেল অবলম্বন করবো। সরকার সরাসরি আবাসন তৈরি না করে 'ফ্যাসিলিটেটর' বা সহায়কের ভূমিকা পালন করবে। প্রাইভেট ডেভেলপার যদি স্যাটেলাইট টাউনশিপে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য নির্ধারিত মানের আবাসন নামমাত্র মূল্যে বা বিনামূল্যে তৈরি করে দেন, তবে একই প্রকল্পে বা অবশিষ্ট জমিতে অতিরিক্ত তলা নির্মাণের অনুমতি বা 'বোনাস এফএসআই' (Incentive Floor Space Index) দেয়া হবে। ফলে প্রকল্পের বাণিজ্যিক অংশ বা লাক্সারি অ্যাপার্টমেন্টগুলো বিক্রি করে গরিব ও মধ্যবিত্তের জন্য আবাসন তৈরির খরচ এবং মুনাফা উঠে আসবে।

ঢাকার উপকণ্ঠে লাক্সারি ফ্ল্যাটের চাহিদা সবসময় পর্যাপ্ত নাও থাকতে পারে, এবং তা ডেভেলপারদের বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করতে পারে। এই সমস্যার সমাধানে আমরা "ট্রান্সফারেবল ডেভেলপমেন্ট রাইটস" বা টিডিআর (TDR) সার্টিফিকেট ব্যবস্থা চালু করব। ধরা যাক, ডেভেলপার সাভারে বা কেরানীগঞ্জে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ফ্ল্যাট তৈরি করেছেন, কিন্তু সেখানে তিনি বোনাস ফ্লোরগুলো বিক্রি করতে পারছেন না। এমতাবস্থায় সরকার তাকে সমমূল্যের 'টিডিআর সার্টিফিকেট' প্রদান করবে। ডেভেলপার এই সার্টিফিকেট ব্যবহার করে ঢাকার গুলশান, বনানী বা ধানমন্ডির মতো প্রাইম লোকেশনে তার নিজস্ব অন্য কোনো প্রজেক্টে রাজউক নির্ধারিত উচ্চতার চেয়ে অতিরিক্ত ফ্লোর করার অনুমতি পাবেন। অথবা, তিনি এই সার্টিফিকেটটি অন্য কোনো ডেভেলপারের কাছে বিক্রি করতে পারবেন। ফলে, ঢাকার অভিজাত এলাকার জমির উচ্চমূল্যকে কৌশলে ব্যবহার করে ঢাকার উপকণ্ঠে গরিব ও মধ্যবিত্তের জন্য সাশ্রয়ী আবাসন তৈরির খরচ মেটানো হবে। এটি আবাসন খাতে সম্পদের সুষম বণ্টনের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

এসব অঞ্চলে বিভিন্ন সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সরিয়ে আনলে কর ছাড়ের মাধ্যমে এই টাউনশিপে মাইগ্রেশন ও কর্মসংস্থান উৎসাহিত করা হবে। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষের যাতায়াত খরচ ও সময় বাঁচাতে আমরা এই টাউনশিপের ভেতরেই কর্মসংস্থান জোন তৈরি করব। হেমায়েতপুরের প্রকল্পে দূষণমুক্ত লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, প্যাকেজিং এবং গার্মেন্টস এক্সেসরিজ তৈরির জন্য নির্ধারিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্লোর স্পেস থাকবে এবং কেরানীগঞ্জ প্রকল্পে তরুণদের জন্য হাই-স্পিড ইন্টারনেটসহ কো-ওয়ার্কিং স্পেস ও কল সেন্টার স্থাপন করা হবে। এছাড়া টাউনশিপের রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা, লন্ড্রি এবং রিটেইল শপগুলোতে স্থানীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রতিটি ব্লকের জন্য নির্দিষ্ট কমিউনিটি গ্রিন স্পেস, শিশুদের খেলার মাঠ এবং বয়স্কদের হাঁটার জায়গা বাধ্যতামূলক থাকবে এবং মোট জমির অন্তত ২৫% উন্মুক্ত সবুজ স্থান হিসেবে সংরক্ষণ করা হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আধুনিক রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং ছাদগুলোতে বাধ্যতামূলক রুফটপ গার্ডেনিং বা সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে এই টাউনশিপগুলোকে পরিবেশবান্ধব মডেল বা 'গ্রিন টাউনশিপ' হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

বরাদ্দ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে এবং স্বজনপ্রীতি রোধ করতে আমরা সম্পূর্ণ ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেয়া হবে। বাড়ি কিনতে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা থাকবে। ধনিক শ্রেণি বা দালাল চক্র যাতে ফ্ল্যাট কিনে নিতে না পারে, সেজন্য কঠোর 'মালিকানা সুরক্ষা' নীতি প্রয়োগ করা হবে। বরাদ্দপ্রাপ্ত ফ্ল্যাট আগামী ১০ বছরের মধ্যে খোলা বাজারে বিক্রি করা যাবে না; যদি কেউ ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে চান, তবে তাকে সেটি সরকার নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত দিতে হবে, যা পরবর্তীতে অপেক্ষমান তালিকার অন্য কোনো যোগ্য প্রার্থীকে দেওয়া হবে। তবে ইনহেরিটেন্স বা উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানা হস্তান্তর করা যাবে। এই পাইলট প্রকল্পগুলো সফল হলে পরবর্তীতে চট্টগ্রাম (কর্ণফূলীর অপর পারে আমানত সেতু, কালুরঘাট সেতু ও কর্ণফুলী টানেলের মাধ্যমে সংযুক্ত), গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ এবং পূর্বাচলের সম্প্রসারিত অংশে একই মডেলের আরও স্যাটেলাইট টাউনশিপ গড়ে তোলা হবে।

জলবায়ু-ঝুঁকিপ্রবণ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই আবাসন ও পুনর্বাসন কর্মসূচি

নদীভাঙন, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও ঘনঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে বসবাস করছে। প্রতি বছর নদীভাঙনে হাজার হাজার পরিবার বসতভিটা ও কৃষিজমি হারিয়ে বাস্তুচ্যুত হবার ফলে তারা দারিদ্র্য, ঋণ ও অনিরাপদ বসবাসে ঠেলে পড়ছে। উপকূলীয় ও চরাঞ্চলে লবণাক্ততা ও নিরাপদ পানির সংকট কৃষি, পশুপালন ও স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। এর সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি পোহাচ্ছে নারী, শিশু ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারগুলো।

এই সংকট মোকাবিলায় নদীভাঙন ও লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র পরিবারদের জন্য একটি জলবায়ু-সহনশীল গ্রামীণ আবাসন ও পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। নিরাপদ ও উপযোগী জমিতে পরিকল্পিত আবাসন ক্লাস্টার গড়ে তোলা হবে। এসব আবাসনে দুর্যোগ-সহনশীল নকশায় উঁচু ভিটা, টেকসই নির্মাণসামগ্রী এবং নিরাপদ পানীয় জল, স্যানিটেশন ও বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। এসব আবাসনে পরিবারগুলোর জন্য স্থায়ী মালিকানা ও নিরাপত্তা দেওয়া হবে, যাতে তারা বারবার বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঝুঁকি থেকে মুক্তি পায়।

জীবিকার অভাবে নদীভাঙন ও জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ পরিবারগুলো বাধ্য হয়ে শহরমুখী হয়। এই প্রবণতা রোধে আবাসন প্রকল্পের সঙ্গে গ্রামভিত্তিক কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এর মধ্যে থাকবে স্থানীয় শিল্প ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ, কৃষি ও মৎস্যের আধুনিকায়ন, প্রশিক্ষণভিত্তিক স্কিল ডেভেলপমেন্ট, এবং গ্রামীণ বাজার ও ভ্যালু-চেইনের সম্প্রসারণ। পাশাপাশি ডিজিটাল সংযোগ ও রিমোট কাজের সুযোগ বাড়িয়ে গ্রামেই টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করা হবে। দরিদ্র পরিবারের জন্য পূর্ণ বা আংশিক সরকারি সহায়তা এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য স্বল্পসুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের ব্যবস্থা থাকবে।

৪। লুটের অর্থনীতি থেকে ন্যায্য রাষ্ট্র: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ

রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার

একটি ন্যায়সংগত, টেকসই ও বিশ্বাসযোগ্য রাজস্বব্যবস্থা কার্যকর ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মূল ভিত্তি। রাষ্ট্র ন্যায্যভাবে কর আদায় করে তা সুশাসনের মাধ্যমে ব্যয় করতে পারলে নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক দৃঢ় হয়। বাংলাদেশে গত এক দশকের বেশি সময় ধরে কর-জিডিপি অনুপাত মাত্র ৬-৭.৮ শতাংশে আটকে আছে যা এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের মধ্যে সর্বনিম্ন। এটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, অবকাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষায় রাষ্ট্রের বিনিয়োগক্ষমতার বড় সীমাবদ্ধতা। তাই রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার একটি প্রশাসনিক সংস্কারের চেয়েও বড় এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠনের জন্য অপরিহার্য। আগামী পাঁচ বছরে দেশের কর-জিডিপি অনুপাত ১২% এ উন্নীত করা হবে।

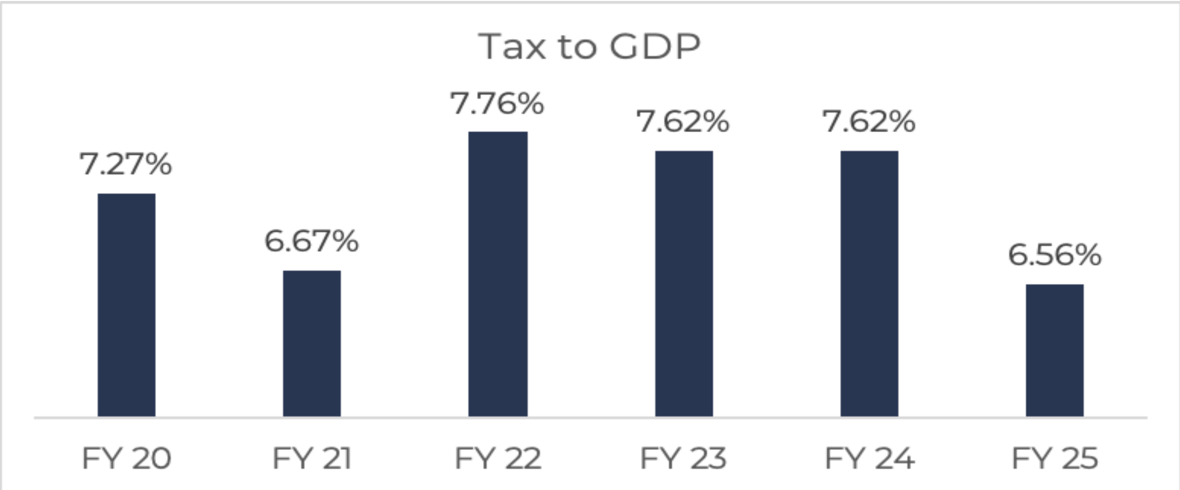

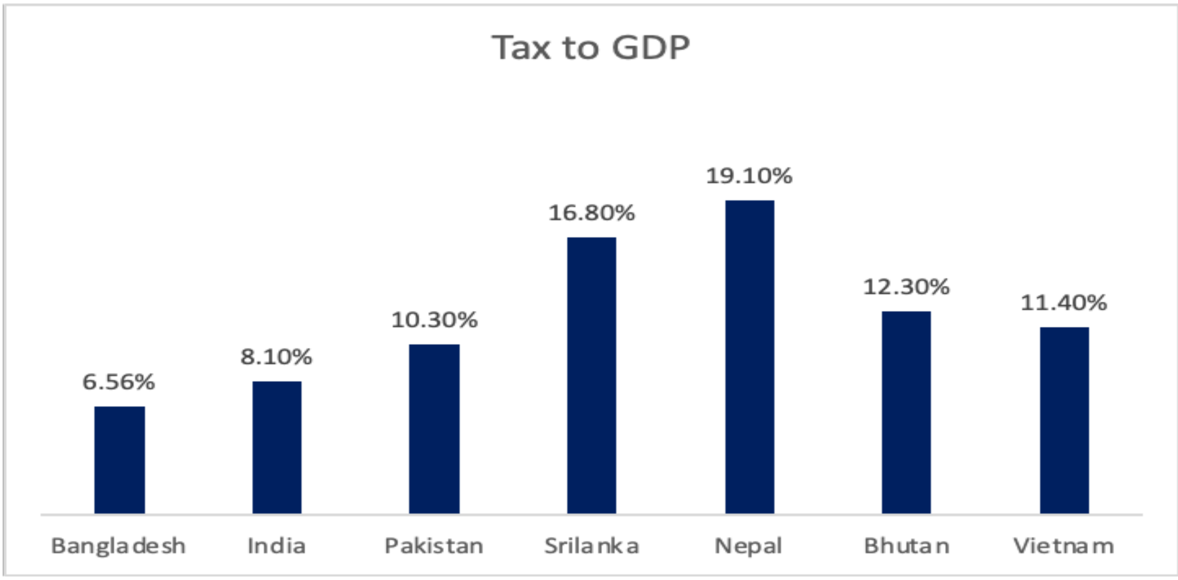

আমরা রাজস্ব সংস্কারের জন্য করের হার নির্বিচারে বাড়াবো না, বরং একটি ন্যায্য ও প্রগ্রেসিভ কর কাঠামো গড়ে তুলবো। বিশেষত বর্তমান ব্যবস্থায় কেবল মধ্যবিত্ত চাকরীজীবিরাই যথাযথ কর দেয়, আর বড় বড় ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা করা ফাঁকি দেয়। কর ফাঁকি রোধে আমরা TIN, NID ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে বাধ্যতামূলক সংযোগ স্থাপন করব। এর ফলে আয় ও সম্পদের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাই করা সম্ভব হবে এবং অঘোষিত আয় ও সম্পদ শনাক্ত করা সহজ হবে। বিদ্যুৎ ব্যবহারের তথ্য এবং ক্রেডিট ব্যুরোগুলোর কার্যক্রমের ভিত্তিতে পরিবারভিত্তিক আয়ের স্তর নির্ধারণ করা হবে। রিটার্ন শূন্য হলেও প্রণোদনার মাধ্যমে করজাল সম্প্রসারণ করে ধাপে ধাপে সবাইকে আনুষ্ঠানিক কর ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে। BBS অনুযায়ী ৬.৯২ কোটি কর্মসংস্থান থাকলেও মাত্র ৪০ লাখ মানুষ ট্যাক্স রিটার্ন দেয়। ভূমি, অ্যাপার্টমেন্ট ও আর্থিক সম্পদের জন্য একটি জাতীয় ডিজিটাল সম্পদ রেজিস্ট্রি চালু করা হবে, যা সম্পদভিত্তিক কর ও উত্তরাধিকার কর বাস্তবায়নকে সহজ করবে এবং কালো টাকার পরিসর ধীরে ধীরে সংকুচিত করবে।

আমরা আয়কর ও সম্পত্তি করের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো গড়ে তুলতে চাই। উৎসে কর, স্ট্যাম্প ডিউটির মতো লেনদেনভিত্তিক কর ধাপে ধাপে যুক্তিসংগত পর্যায়ে নামানো হবে, যাতে ব্যবসা ও লেনদেন নিরুৎসাহিত না হয়। এর বিপরীতে "বার্ষিক প্রপার্টি ট্যাক্স"কে শক্তিশালী করা হবে এবং এটিকে স্থানীয় সরকারের একটি স্থায়ী ও টেকসই আয়ের উৎসে পরিণত করা হবে। সব ধরনের করছাড় ও কর সুবিধার পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক ও সহজপ্রাপ্য করা হবে। যেসব করছাড় নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য উপকারি নয়, সেগুলো ধাপে ধাপে বাতিল করা হবে। শিল্পখাতে ইউনিফর্ম করহার নীতি প্রণয়ন করা হবে এবং বিদ্যমান ২৭.৫% থেকে করহার ধাপে ধাপে ২০% এ নামানো হবে। তবে কৌশলগত ও বিশেষ শিল্পখাতের জন্য সীমিত ও সময়সীমাবদ্ধ প্রণোদনা বহাল থাকবে। ভবিষ্যতে দেয়া প্রণোদনা হবে লক্ষ্যভিত্তিক, সময়সীমাবদ্ধ, ফলাফল নির্ভর এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পর্যালোচনাযোগ্য।

আমরা করভিত্তি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ডিজিটাল অর্থনীতিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে দেখি। ক্যাশলেস অর্থনীতি গড়ে তুলতে ডিজিটাল পেমেন্ট অবকাঠামো সম্প্রসারণ করা হবে এবং ধাপে ধাপে "কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডিজিটাল মুদ্রা (CBDC) চালু করা হবে। এর ফলে লেনদেনের স্বচ্ছতা বাড়বে, ছায়া অর্থনীতি সংকুচিত হবে এবং কর আদায়ের পরিধি বিস্তৃত হবে। আমরা গিগ ইকোনমি, অনলাইন ব্যবসা ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মভিত্তিক আয়ের জন্য সহজ, ন্যায্য ও ব্যবহারবান্ধব করব্যবস্থা চালু করব, যাতে নতুন অর্থনৈতিক খাতগুলো করব্যবস্থার আওতায় আসে কিন্তু অপ্রয়োজনীয় জটিলতায় আটকে না পড়ে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (NBR) আধুনিকায়ন এই সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে। নীতিনির্ধারণকে দীর্ঘমেয়াদি, কৌশলগত ও ডেটাভিত্তিক এবং প্রশাসনকে সেবামুখী ও পক্ষপাতহীন করার জন্য করনীতিনির্ধারণ ও কর প্রশাসনকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আলাদা করা হবে। র‍্যান্ডম অডিট, ই-অ্যাসেসমেন্ট ও ডেটা অ্যানালিটিক্স ব্যবহারের মাধ্যমে করদাতাদের হয়রানি কমানো হবে। ট্যাক্সপেয়ার চার্টারকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং রিটার্ন প্রসেসিংয়ের সময়সীমা, আপিল ব্যবস্থা, অভিযোগ নিষ্পত্তি ও তথ্য সুরক্ষার স্পষ্ট মানদণ্ড নির্ধারিত থাকবে। সেক্টরভিত্তিক বৈষম্য ও রেন্ট সিকিং কমানোর মাধ্যমে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে শিল্পখাতে "একরূপ করহার" চালু করা হবে। তবে গভীর প্রযুক্তি, উচ্চ মূল্য সংযোজন

ও পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগের মতো কৌশলগত অগ্রাধিকার খাতে পারফরম্যান্সভিত্তিক প্রণোদনা দেওয়া হবে। সরকারের "পূর্ণ বাজেট বরাদ্দ খাতভিত্তিকভাবে পুনঃপরীক্ষা" (budget review & audit) করা হবে। ফলে কোথায় বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী বরাদ্দ দরকার, আর কোথায় অদক্ষতা, অপচয় ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমিয়ে সাশ্রয় সম্ভব, তা চিহ্নিত করে কার্যকর ব্যয় সংকোচন নিশ্চিত করা হবে।

এই পুরো সংস্কার একটি সুস্পষ্ট বাস্তবায়ন রোডম্যাপের মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়া হবে। প্রথম বছরে আমরা আইন সংশোধন, ডেটা সংযোগ ও পাইলট প্রকল্প চালু করব। দ্বিতীয় বছরে বড় শহরগুলোতে প্রপার্টি ট্যাক্স বাস্তবায়ন এবং ঝুঁকি-ভিত্তিক অডিট কমপক্ষে ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে কার্যকর করা হবে। রাস্তা, মহাসড়ক ও নদীতীরের সব ইজারা বাতিল করে সরকার নিজে রাজস্ব আদায় করবে, আর ফুটপাত ব্যবসা সিটি কর্পোরেশন–পৌরসভার মাধ্যমে বৈধ ও করের আওতায় এনে চাঁদাবাজি বন্ধ করা হবে। তৃতীয় বছরের মধ্যে জাতীয় ডিজিটাল সম্পদ রেজিস্ট্রি চালু করা হবে এবং ৫ বছরের মধ্যে কর–জিডিপি অনুপাত কমপক্ষে ১২ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য অর্জন করা হবে।

সংস্কার ক্ষেত্র	**বর্তমান অবস্থা**	**সংস্কার উদ্যোগ**	**৫ বছর শেষে ফলাফল**	**বার্ষিক অতিরিক্ত রাজস্ব**
করজাল সম্প্রসারণ	৪০ লাখ রিটার্নদাতা	প্রথম তিন বছর নতুন ট্যাক্স ফাইলকারীদের জন্য ন্যূনতম কর মাত্র ১,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হবে, এবং এই পুরো অর্থটি বিদ্যুৎ, বিলের বিপরীতে ক্যাশব্যাক হিসেবে ফেরত দেওয়া হবে। ডিজিটাল ফাইলিং ও কর সচেতনতা বিষয়ক ক্যাম্পেইন/ শিক্ষা	রিটার্নদাতা ২.৫ কোটি	৩০হাজার কোটি
কর ফাঁকি রোধ	TIN–NID বিচ্ছিন্ন	TIN–NID–ব্যাংক–ইউটিলিটি সংযোগ বাধ্যতামূলক	১৫–২০% আন্ডার-রিপোর্টিং শনাক্ত	৫০ হাজার কোটি
প্রপার্টি ট্যাক্স	কার্যত অনুপস্থিত	ডিজিটাল সম্পদ রেজিস্ট্রি, সব সম্পত্তি মালিকের জন্য ভাড়ার আয় আগাম কর (AIT) দিতে হবে এবং এটি আয়ের হিসাব হিসেবে বাধ্যতামূলকভাবে রিপোর্ট	১.২–১.৫ কোটি সম্পত্তি করের আওতায়	৪০ হাজার কোটি

করছাড় সংস্কার	অনস্বচ্ছ ও রেন্ট সিকিং	করছাড় প্রকাশ ও সময়সীমা নির্ধারণ	৩০–৪০% ছাড় বাতিল	৩০ হাজার কোটি
ডিজিটাল অর্থনীতি (নগদ আয় ডিজিটালাইজেশন)	ছায়া লেনদেন বেশি (নগদ লেনদেনে ব্যাপক কর ফাঁকি)	ক্যাশলেস পেমেন্ট, CBDC, নির্দিষ্ট সীমার বেশি নগদ লেনদেন নিরুৎসাহন, ডিজিটাল পেমেন্ট বাধ্যতামূলক, POS/QR ট্র্যাকিং	অনলাইন ও গিগ আয় করের আওতায়	৫০ হাজার কোটি
দুর্নীতি দমন (Tax Administration)	লিকেজ, রেন্ট সিকিং, ঘুষ	ই-অ্যাসেসমেন্ট, অটোমেশন, বন্দর কার্যক্রমের সম্পূর্ণ প্রান্ত-থেকে-প্রান্ত ই-ম্যানিফেস্ট, ই-ভ্যালুয়েশন, আধুনিক কন্টেইনার স্ক্যানার চালুর মাধ্যমে কাস্টমস শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক (SD) ও অন্যান্য রাজস্বে ফাঁকি এবং মানবিক হস্তক্ষেপজনিত দুর্নীতি কার্যকরভাবে বন্ধ করা হবে।	রাজস্ব অপচয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে	৩০ হাজার কোটি
মোট অতিরিক্ত রাজস্ব				**২.৩ লক্ষ কোটি টাকা /বছর**

রপ্তানি বৈচিত্র্য

বাংলাদেশের রপ্তানি সাফল্যের মূল চালিকাশক্তি দীর্ঘদিন ধরে তৈরি পোশাক শিল্প (RMG)। এই খাত আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান দিয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার জোগান নিশ্চিত করেছে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান দৃঢ় করেছে। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৮২ শতাংশই আসে তৈরি পোশাক শিল্প থেকে। তবে একই সঙ্গে বাস্তবতা হলো, একটি মাত্র খাতের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা আমাদের অর্থনীতিকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। বৈশ্বিক মন্দা, ভূরাজনৈতিক সংকট বা বাণিজ্যনীতির পরিবর্তনে যদি এই ক্ষাতের সামান্যও প্রভাব পরে, তবে সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি থেমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই আমরা বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য বহুমাত্রিক ও স্থিতিস্থাপক রপ্তানি পোর্টফোলিও গড়ে তুলতে চাই। ২০২১–২২ অর্থবছরে ডাবল কাউন্টিংয়ের কারণে রপ্তানি পরিসংখ্যান কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে দেখানো হয়, যা প্রকৃত চিত্রকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে এবং নীতিনির্ধারণকে বিভ্রান্ত করেছে।

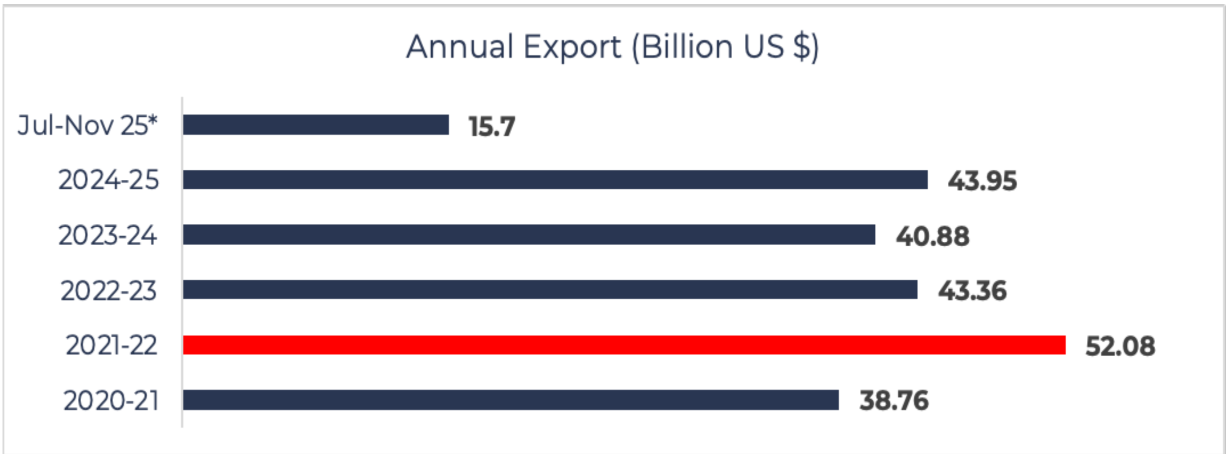

প্রথমত, RMG খাতকে দুর্বল না করে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উচ্চ মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করা হবে। টেকনিক্যাল টেক্সটাইল, পারফরম্যান্স ফ্যাব্রিক, উন্নত ডিজাইন সক্ষমতা, পরিবেশ ও সামাজিক মানদণ্ডে (sustainability compliance) উত্তরণ এবং Product Lifecycle Management, Computer-Aided Design & Computer-Aided Manufacturing এর মতো আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো হবে। এর ফলে বাংলাদেশ শুধু সস্তা উৎপাদনকারী নয়, বরং উচ্চমানের ও দায়িত্বশীল পোশাক উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে অবস্থান সুদৃঢ় করবে। দ্বিতীয়ত, রপ্তানির ভিত্তি বিস্তৃত করতে RMG এর পাশাপাশি নতুন নতুন খাতে লক্ষ্যভিত্তিক ও পরিকল্পিতভাবে প্রবেশ করা হব। রপ্তানির বৈচিত্র্য আনার জন্য আমরা দশটি অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করেছি: কৃষি ও অ্যাগ্রো-প্রসেসিং ফুটওয়্যার ও লেদার গুডস, আইটি ও ডিজিটাল সেবা, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, নির্মাণসামগ্রী, লজিস্টিকস, প্লাস্টিক ও কম্পোজিট পণ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস ও API, ভ্যালু অ্যাডেড জুট পণ্য ও শিপবিল্ডিং শিল্প, রিনিউএবল এনার্জি ইকুইপমেন্ট এবং সেমিকন্ডাক্টর প্যাকেজিং। এসব খাতে উন্নয়নের জন্য যেখানে মান-পরিকাঠামো, শিল্প ক্লাস্টার, দক্ষ জনবল, ট্রেড ফাইন্যান্স ও নীতিগত সহায়তার ভিত্তিতে একটি সমন্বিত ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা হবে। রপ্তানি বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে বাজার অভিমুখী কূটনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, জাপান, ভারত, চীন ও মধ্যপ্রাচ্যের মতো প্রধান বাজারগুলোর জন্য আলাদা পণ্য ফিট ও রেগুলেটরি কৌশল নেওয়া হবে। পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিদের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে নন ট্যারিফ ব্যারিয়ার মোকাবিলা ও নতুন বাজারে প্রবেশ সহজ করা হবে।

রপ্তানির ক্ষেত্রে সময়ের মূল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কাস্টমস অটোমেশন, প্রি-অ্যারাইভাল ক্লিয়ারেন্স, বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা এবং একটি কার্যকর সিঙ্গেল-উইন্ডো ট্রেড প্ল্যাটফর্ম চালু করা হবে। বন্দরে পণ্য খালাসের সময় ২ দিনে নিয়ে আসা হবে, রেল ও নৌপথে সংযোগ বাড়ানো, কোল্ড-চেইন এবং আধুনিক অ্যাগ্রো-লজিস্টিকস গড়ে তোলার মাধ্যমে রপ্তানির গতি ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো হবে। রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য একটি শক্তিশালী ও স্বচ্ছ ফিনান্সিং কাঠামো গড়ে তোলা হবে। লক্ষ্যভিত্তিক স্বল্পসুদের লাইন অব ক্রেডিট, এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি এবং ইনভয়েস ডিসকাউন্টিং সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে। কোনো "প্রোডাকশন লিংকড ইনসেনটিভ" (PLI) দেয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, সময়সীমাবদ্ধতা ও অডিটযোগ্যতা নিশ্চিত করা হবে এবং বাধ্যতামূলক ডিসক্লোজার ও সানসেট ক্লজ থাকবে।

আমরা সার্ভিসেস এক্সপোর্টকে ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির একটি বড় স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করি। আইটি ও আইটিইএস খাতে স্কেল আপের জন্য কোর্স-টু-ক্যারিয়ার পাইপলাইন, আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেশন, ডেটা প্রোটেকশন ও প্রাইভেসি স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করব। রিমোট ওয়ার্ক ভিসা ও শ্রম মোবিলিটি সংলাপের মাধ্যমে বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের মানবসম্পদের প্রবেশ সহজ করব। ফ্রিল্যান্সার ও স্টার্টআপদের রেমিট্যান্স আনতে সকল ডিজিটাল প্রতিবন্ধকতা দূর করা হবে।

ভবিষ্যৎ বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে সবুজ ও নৈতিক উৎপাদন অপরিহার্য। তাই আমরা CBAM-এর জন্য প্রস্তুতি, রিনিউএবল এনার্জির ব্যবহার, গ্রিন ফাইন্যান্স ও ESG রিপোর্টিংকে উৎসাহিত করব। এর মাধ্যমে "Made in Bangladesh 2.0"-কে একটি দায়িত্বশীল, টেকসই ও বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

বিনিয়োগ পরিবেশ

একটি দেশের টেকসই প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য শক্তিশালী বিনিয়োগ পরিবেশ অপরিহার্য। দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা শুধু প্রণোদনা বা করছাড় দেখে সিদ্ধান্ত নেন না। তারা ব্যবসার খরচ কত, নীতিনীতির স্থিতিশীলতা এবং চুক্তি ও আইনের বিশ্বাসযোগ্যতাও বিবেচনা করেন। আমাদের লক্ষ্য আগামী পাঁচ বছরে FDI-GDP অনুপাত ২ শতাংশে উন্নীত করা। এজন্য আমরা ব্যয় হ্রাস, রেগুলেটরি সরলীকরণ এবং আস্থা ও বিশ্বাস নির্মাণে গুরুত্ব দেব।

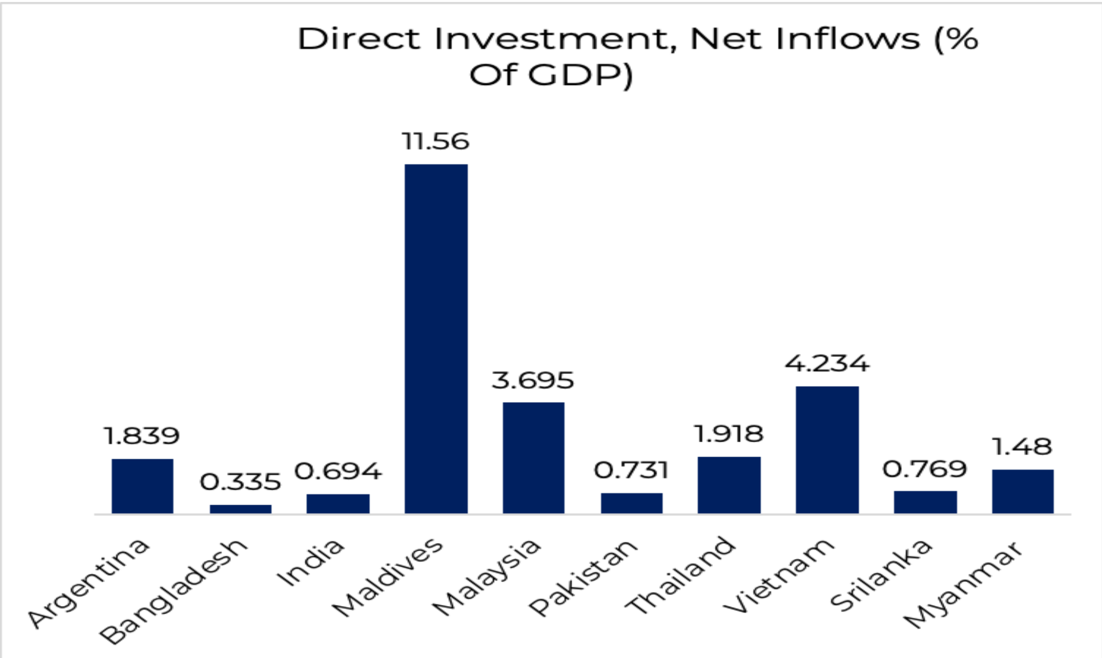

বিনিয়োগ ব্যয়ের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে অবকাঠামোগত খরচ। প্রথমত বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে সেবার মান ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা হবে। বিনিয়োগকারীরা যেন পাঁচ বছরের আর্থিক পরিকল্পনা অনিশ্চয়তা ছাড়াই করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে ডিমান্ড-সাইড ম্যানেজমেন্ট, সিস্টেম লস কমানো এবং ট্যারিফ কাঠামোকে পূর্বানুমেয় করা হবে। একই সঙ্গে বন্দরে

পণ্য খালাসের সময় কমানো, রেল ও সড়কসহ ইন্টার-মোডাল কানেক্টিভিটি জোরদার করা এবং কাস্টমস ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে প্রতি কন্টেইনারে ঘণ্টা ও দিনের অপচয় কমানো হবে। বিনিয়োগকারীদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকগুলোর একটি হলো জটিল ও ধীরগতির নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা। আমরা ওয়ান-স্টপ সার্ভিস কেবল কাগজে কলমে নয়, বাস্তবেই কার্যকর করতে চাই। ই-পেমেন্ট, ই-ডকুমেন্ট, ই-সিগনেচার এবং প্যারালাল প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে সব অনুমোদন প্রক্রিয়া সময়সীমাবদ্ধ ও ডিজিটাল করা হবে। অপ্রয়োজনীয় ও পুরোনো নিয়ম বাতিল করতে "রেগুলেটরি গিলোটিন" প্রয়োগ করা হবে। বিনিয়োগ পরিবেশের মান নিয়মিত পরিমাপের জন্য ADB ও IFC-এর আদলে ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট অ্যাসেসমেন্ট চালু করে বার্ষিক বেঞ্চমার্কিং করা হবে। বিনিয়োগ আস্থার অন্যতম ভিত্তি হলো চুক্তির পবিত্রতা। তাই কমার্শিয়াল কোর্টে দ্রুত বিচার, পাশাপাশি কার্যকর মেডিয়েশন ও আরবিট্রেশন ব্যবস্থা চালু করা হবে। বিদেশি সালিশি রায় (foreign arbitral award) বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা হবে। বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য ৩০, ৬০ ও ৯০ দিনের নির্দিষ্ট এসক্যালেশন টাইমলাইন থাকবে, যাতে অধিকাংশ সমস্যা প্রশাসনিক স্তরেই দ্রুত সমাধান করা যায়।

ভূমি প্রাপ্তিও শিল্প অবকাঠামো বিনিয়োগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আমরা ভূমির বিশুদ্ধ মালিকানা নিশ্চিত করা, ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড চালু করা এবং ইউটিলিটি রেডি ইকোনমিক জোন গড়ে তোলার ওপর জোর দেব। বিনিয়োগকারীদের জন্য 'শুধু জমি' নয়, বরং বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও সংযোগসহ 'ইকুইপড প্লট' সরবরাহ করা হবে। আমাদের লক্ষ্য সাইট সিলেকশন থেকে পূর্ণ অপারেশন শুরু পর্যন্ত সময় ১৮ মাসে নামিয়ে আনা।

আন্তর্জাতিক বিনিয়োগে আরেকটি বড় বাধা হলো কর অনিশ্চয়তা। তাই প্রধান উৎস ও বাজার দেশগুলোর সঙ্গে "ডাবল ট্যাক্সেশন এভয়ডেন্স এগ্রিমেন্ট" (DTA) বিস্তৃত করা হবে। একই সঙ্গে BEPS-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করব্যবস্থা হবে স্বচ্ছ, বিনিয়োগবান্ধব ও প্রতিযোগিতামূলক।

বৃহৎ অবকাঠামো ও সেবা খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে PPP ও প্রজেক্ট ফাইন্যান্স কাঠামো শক্তিশালী করা হবে। প্রতিটি প্রকল্পে নতুন করে দরকষাকষির প্রয়োজন হ্রাস করতে ঝুঁকি বণ্টনে স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা আনা, VGF নীতিমালা উন্নত করা এবং "স্ট্যান্ডার্ড কনসেশন এগ্রিমেন্ট" চালু করা হবে। ব্যাংক, বন্ড, বীমা ও পেনশন ফান্ডসহ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের PPP যোগ্য সম্পদশ্রেণিতে যুক্ত করা হবে।

নীতির পূর্বানুমেয়তা নিশ্চিত করতে হঠাৎ নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার সংস্কৃতি পরিহার করা হবে। যেকোনো নীতিগত পরিবর্তনে পাবলিক কনসালটেশন, ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট ও স্পষ্ট ট্রানজিশন টাইমলাইন নিশ্চিত করা হবে। সব ধরনের প্রণোদনা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে সময়সীমাবদ্ধ, পারফরম্যান্স লিঙ্কিং ও নিয়মিত পর্যালোচনাযোগ্যতায় গুরুত্ব দেয়া হবে।

অনুমোদনের পরও বিনিয়োগকারীদের পাশে থাকার জন্য শক্তিশালী ইনভেস্টর আফটারকেয়ার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি বড় বিনিয়োগের জন্য অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার ধাঁচের সাপোর্ট থাকবে। লোকাল সাপ্লাই চেইন সংযোগ, দক্ষ জনবল, আইনি কমপ্লায়েন্স এবং রপ্তানি সুবিধা সবকিছুতে সমন্বিত সহায়তা নিশ্চিত করা হবে। স্থানীয় ও বিদেশি উভয় বিনিয়োগকারীর জন্য ব্যবসার ওপর থাকা সব রাজনৈতিক ব্যয় কমানো হবে। রাস্তায় চাঁদাবাজি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হবে।

মুদ্রানীতি সংস্কার, ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগ ও আর্থিক শিক্ষা

আমরা বিশ্বাস করি মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রন, রাষ্ট্রের বিনিয়োগ ঝুঁকিমুক্ত রাখা এবং নাগরিকরা আর্থিকভাবে সক্ষম হওয়া একটি স্থিতিশীল ও সুষম অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারে। দেশের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা এবং জনস্বার্থের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আমরা তিনটি দিকে নজর দেব: মুদ্রানীতি ও কারেন্সি বাজার সংস্কার, সরকারি বিনিয়োগ নীতি, এবং প্রাথমিক আর্থিক শিক্ষা।

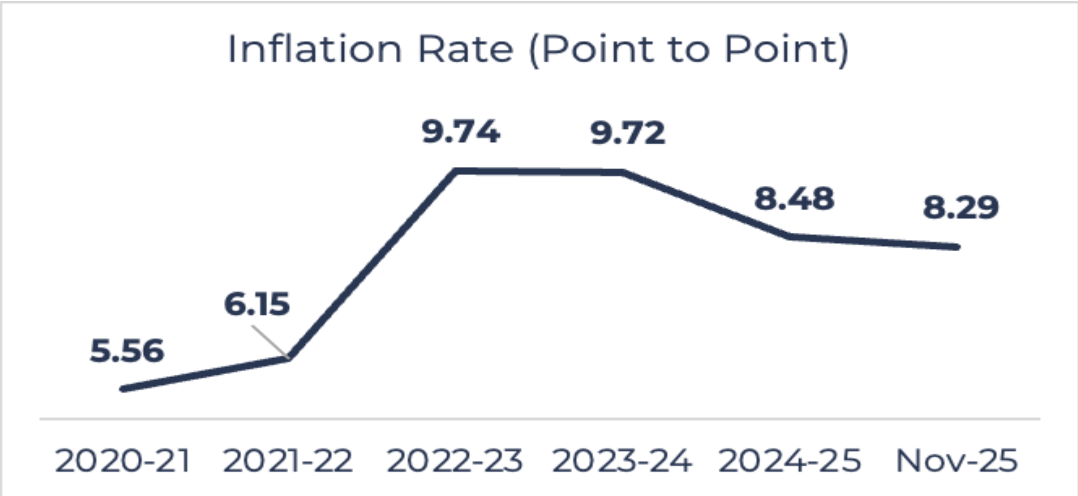

মুদ্রানীতি ও কারেন্সি বাজার সংস্কার করা হবে। দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখে তা ৬%-এর নিচে রাখা হবে, যাতে সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীরা ক্রয়ক্ষমতা বজায় রেখে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে পারে। বাংলাদেশী টাকা বাজার ভিত্তিক ফ্লোটিং সিস্টেমে মূল্য নির্ধারণ হবে এবং ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটের স্বচ্ছতা এবং রিপোর্টিং বাধ্যতামূলক হবে। পাশাপাশি ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ পুনর্গঠন করা হবে, যাতে বৈদেশিক শক, রপ্তানি প্রবাহের অস্থিরতা এবং ঋণ পরিশোধের ঝুঁকি সীমিত রাখা যায়। সরকারি বিনিয়োগ নীতিকে ঝুঁকিমুক্ত ও জনস্বার্থভিত্তিক করা হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান কেবল সরকারি ও মিউনিসিপ্যাল বন্ডে বিনিয়োগ করবে। এতে বিনিয়োগকে ঝুঁকিমুক্ত থাকবে, আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় থাকবে এবং জনগণের জন্য সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। উচ্চ ঝুঁকির প্রকল্পে বিনিয়োগ কেবল স্পষ্ট ম্যান্ডেট ও রিস্ক ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে অনুমোদিত হবে। প্রতিটি বিনিয়োগে স্বচ্ছতা, ত্রৈমাসিক রিপোর্টিং, ঝুঁকি পরিমাপ এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা হবে।

আর্থিক শিক্ষা স্কুল পর্যায় থেকে শুরু হবে। ক্লাস ৪/৫ থেকেই শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে শিখবে সঞ্চয় ব্যয় পরিকল্পনা, সহজ সুদ ও চক্রবৃদ্ধি, বাজেট, লক্ষ্য স্থাপন, ডিজিটাল নিরাপত্তা, মৌলিক কর বোধ এবং ঝুঁকি কভারেজ। শিক্ষার মডিউল গেমিফাইড এবং মাতৃভাষায় হবে এবং এজন্য শিক্ষকরা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পাবেন। কর্মজীবনে ক্রমাগত শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ইলেকটিভ কোর্স এবং কর্মজীবীদের জন্য মাইক্রোকোর্স চালু হবে। এসব কোর্সে

অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঋণ স্বাস্থ্য, ক্রেডিট স্কোর, ডাইভার্সিফাইড বিনিয়োগ, পেনশন পরিকল্পনা, বিমা চয়ন এবং স্ক্যাম ডিটেকশন। নারী উদ্যোক্তা, কৃষক, প্রবাসী পরিবার এবং গিগ ওয়ার্কারদের জন্য কাস্টম মডিউল থাকবে। রাষ্ট্র-বেসরকারি সমন্বয় জোরদার করা হবে। ব্যাংক, বীমা, পুঁজিবাজার এবং ফিনটেক মিলিয়ে জাতীয় আর্থিক সাক্ষরতা মিশন পরিচালিত হবে। বছরে ৫০ লাখ এর অধিক নাগরিক স্কিলিং, ১০ লাখ শিক্ষার্থী মৌলিক আর্থিক সাক্ষরতা এবং ১ লাখ শিক্ষক প্রশিক্ষণ পাবেন। সার্টিফায়েড ট্রেইনার পুল গড়ে তোলা হবে।

LDC গ্র্যাজুয়েশন ও ঋণ শাসন

LDC থেকে উত্তরণ আমাদের অর্জন। কিন্তু একই সঙ্গে এটি বাজার অ্যাক্সেস সংকোচন, রপ্তানি ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক ঋণের খরচ বাড়াবে। আমরা LDC উত্তরণকে লড়তে চাই পরিকল্পিত, ধাক্কাহীন, বিশ্বাসযোগ্য এবং স্থিতিশীল। এই লক্ষ্যে রপ্তানি অ্যাক্সেস সংরক্ষণ ও বিস্তারে আগাম কূটনৈতিক ও কারিগরি প্রস্তুতি নেওয়া হবে। LDC সুবিধা ফেজ আউটের আগেই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) ও সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (CEPA) আলোচনায় গতি আনা হবে। Rules of Origin, ট্যারিফ কোটা, ফাইটোস্যানিটারি ও টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড, এবং ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের TRIPS সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতাসহ (পেটেন্ট, ডাটা প্রোটেকশন ও জেনেরিক ওষুধ উৎপাদন) সেক্টরভিত্তিক বিশেষায়িত টিম কাজ করবে। বাজার হারানোর ঝুঁকি কমাতে আঞ্চলিক সাপ্লাই চেইন পার্টনারশিপ গড়ে তোলা হবে। উত্তরণ পর্বে লক্ষ্যভিত্তিক ট্রানজিশন সেফটি নেট চালু করা হবে। RMG সহ অগ্রাধিকার খাতে PLI ধাঁচের ট্রানজিশনাল সাপোর্ট দেওয়া হবে। এগুলো হবে নন-ডিস্টরটিভ, সময়সীমাবদ্ধ ও WTO সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সহায়তা শ্রমিক কল্যাণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও বাজার বৈচিত্র্যে কেন্দ্রীভূত থাকবে। একই সঙ্গে গ্রিন আপগ্রেড ফান্ড, টেক মডার্নাইজেশন লাইন এবং ফার্মা শিল্পের TRIPS কমপ্লায়েন্স সহ প্রযুক্তি ও উৎপাদন ক্ষমতা উন্নয়ন চালু করে প্রতিযোগিতা শক্তিশালী করা হবে।

LDC থেকে উত্তরণের পর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটবে, যা হলো বাংলাদেশের জন্য উন্নয়ন সহযোগী ও বহুপাক্ষিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (DFI) স্বল্পব্যয়ী অর্থায়নের প্রবেশাধিকার ধীরে ধীরে কমে আসা। বিশ্বব্যাংক, IFC, ADB, JICA, KfW, AFD সহ অন্যান্য উন্নয়ন অর্থায়ন সংস্থার কনসেশনাল ঋণ ও দীর্ঘ গ্রেস পিরিয়ড ভিত্তিক তহবিলের পরিমাণ হ্রাস পাবে এবং নতুন অর্থায়নে সুদের হার, ম্যাচিউরিটি ও শর্ত হবে তুলনামূলকভাবে কঠোর। ফলে একই পরিমাণ বৈদেশিক অর্থায়নের বিপরীতে ভবিষ্যতে বাজেট ও বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ বাড়বে। এই বাস্তবতায় আমাদের নীতি হলো LDC উত্তরণ পরবর্তী সময়ে ঋণ নেওয়ার পরিমাণ নয়, বরং ঋণের মান, উদ্দেশ্য ও ঝুঁকি প্রোফাইল এ গুরুত্ব দেয়া। যথাসম্ভব কনসেশনাল ও ব্লেন্ডেড ফাইন্যান্স অগ্রাধিকার পাবে। ব্যয়বহুল বাণিজ্যিক ঋণ কেবলমাত্র উচ্চ রিটার্ন ও বৈদেশিক মুদ্রা আয় সৃষ্টিকারী প্রকল্পেই সীমাবদ্ধ থাকবে। একই সঙ্গে কম অর্থে বেশি উন্নয়ন ফলাফল অর্জনে DFI দের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠন করে গ্যারান্টি, রিস্ক শেয়ারিং, PPP ভায়াবিলিটি সাপোর্ট ও টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স নির্ভর সহযোগিতার দিকে ঝুঁকানো হবে।

ঋণ চুক্তির সারাংশ, যেমন হার, ফি, গ্রেস পিরিয়ড, কন্ডিশনালিটি ও কনফিডেনশিয়ালিটি ক্লজ এর মধ্যে যা প্রকাশযোগ্য, তা প্রাক ও পরবর্তী উভয় পর্যায়ে প্রকাশ করা হবে। ত্রৈমাসিক ডেট বুলেটিন বাধ্যতামূলক করা হবে এবং SOE গ্যারান্টি ও

কনটিনজেন্ট লায়াবিলিটিতে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। বৈদেশিক মুদ্রা স্থিতিশীলতার জন্য স্পষ্ট গার্ডরেইল নির্ধারণ করা হবে। External Debt Servicing Coverage, স্বল্পমেয়াদি বহির্ঋণ রেশিও ও রিজার্ভ অ্যাডিকোয়েসির ন্যূনতম সীমা প্রকাশ্যভাবে নির্ধারণ ও নিয়মিত প্রকাশ করা হবে। পাওয়ার সেক্টরে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার চাপ হ্রাস করে রিজার্ভ বৃদ্ধি করা হবে। রিজার্ভের একটি অংশ স্বর্ণসহ (precious metals) বিভিন্ন নিরাপদ অ্যাসেট ক্লাসে বিনিয়োগ করা হবে। রপ্তানি ও রেমিট্যান্সে বৈচিত্র্য আনার পাশাপাশি ফরোয়ার্ড ও সোয়াপ বাজার গড়ে তুলে এক্সচেঞ্জ রেট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা হবে।

ব্যাংকিং ও আর্থিক খাত

দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলো ব্যাংকিং ও আর্থিক খাত। ব্যাংকিং খাত দুর্বল হলে বিনিয়োগ থেমে যায়, কর্মসংস্থান ঝুঁকিতে পড়ে এবং সাধারণ মানুষের সঞ্চয় অনিরাপদ হয়। আমরা বিশ্বাস করি শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ফিরিয়ে আনতে পারলেই ব্যাংকিং খাত আবার প্রবৃদ্ধির সহায়ক শক্তিতে পরিণত হবে। আওয়ামী লীগ ইচ্ছাকৃতভাবে গুরুত্বপূর্ণ NPL ডেটা ম্যানিপুলেশন করেছে এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড লঙ্ঘন করে NPL মাত্র ১১%-এর নিচে দেখিয়েছে, যা বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বর্তমানে বাস্তব চিত্রে NPL ৩৫%+ ছাড়িয়ে গেছে, যা পূর্বের তথ্যের অসত্যতা স্পষ্ট করে। আমরা আগামী পাঁচ বছরে খেলাপি ঋণ (NPL) চলমান সংস্কারের মাধ্যমে ৩৫%+ থেকে ১০%-এর নিচে নামাতে চাই। এজন্য ব্যাংকগুলোর মূলধন শক্তিশালী করা এবং উৎপাদনমুখী ও গুণগত ঋণ বিস্তার নিশ্চিতে গুরুত্ব দেয়া হবে।

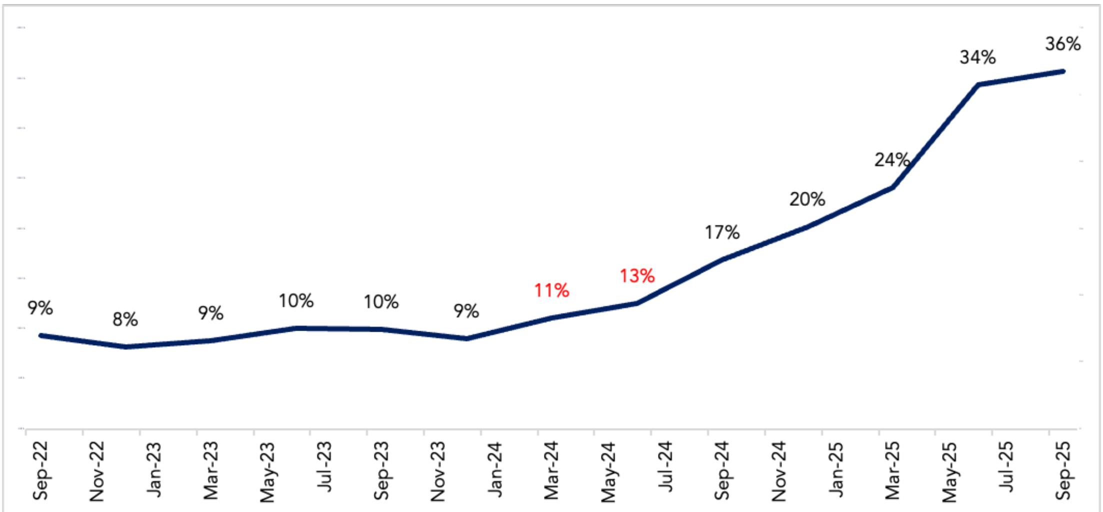

এই লক্ষ্যে প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ণ স্বাধীনতা। মুদ্রানীতি, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ সহ সব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত এবং রুল বেসড সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করা হবে। ব্যাংকের লাইসেন্স প্রদান, মালিকানা পরিবর্তন, বোর্ড ও ব্যবস্থাপনা নিয়োগে যথাযথ মানদণ্ড নিশ্চিত করা হবে। কোনো ব্যাংকের মূলধন, সম্পদের মান, লাভজনকতা বা তারল্যে গুরুতর অবনতি দেখা দিলে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (PCA) স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হবে। খেলাপি ঋণ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে আমরা কাঠামোগত সংস্কার করব। “ডিস্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি” (AMC) গঠন করে স্বচ্ছ

মূল্যায়নের ভিত্তিতে খেলাপি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আদায় জোরদার করা হবে এবং আদালতের সহায়তায় দ্রুত রিকভারি নিশ্চিত করা হবে। বাজারনির্ভর ব্যাংক একীভূতকরণ বা প্রয়োজনে এক্সিটের সুযোগ রাখা হবে। তবে সব ক্ষেত্রে আমানতকারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স সীমা পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হবে। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি শনাক্তে একটি কেন্দ্রীয় ডেটাবেইস গড়ে তুলে সকল ব্যাংকের মধ্যে বাধ্যতামূলক তথ্য বিনিময় চালু করা হবে। দেশ–বিদেশে অর্জিত অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্তসহ কঠোর আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের সকল নাগরিক সুবিধা প্রত্যাহার করা হবে, তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না এবং এসব বিষয়ে হাইকোর্ট থেকে কোনো স্থগিতাদেশ (স্টে অর্ডার) দেওয়া বা কার্যক্রম বন্ধ করার সুযোগ থাকবে না।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে প্রায় ৭২% মানুষ এখনও ব্যাংকিং সেবার বাইরে, যেখানে নারীরা সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে। আমরা সহজ অ্যাকাউন্ট, ডিজিটাল ব্যাংকিং ও সামাজিক ভাতা–ভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত আনব্যাংকড জনগোষ্ঠী কমিয়ে আনব।

সুদহার ব্যবস্থাপনায় কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ পরিহার করে বাজারভিত্তিক ব্যবস্থা চালু করা হবে। মুদ্রানীতির প্রভাব অর্থনীতিতে কার্যকরভাবে পৌঁছানোর জন্য সুদহার হবে স্বচ্ছ বেঞ্চমার্ক লিঙ্কড। ইন্টারব্যাংক, কলমানি ও ট্রেজারি মার্কেট গভীর করা হবে। একই সঙ্গে গ্রাহক সুরক্ষায় সব ধরনের ফি, মার্জিন ও প্রিপেমেন্ট চার্জ স্পষ্টভাবে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হবে।

বিদেশি মুদ্রা ও তারল্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বাজারভিত্তিক ও নমনীয় ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে। বিনিময় হারে অস্থিরতা হলে সীমিত ও স্বচ্ছ হস্তক্ষেপ করা হবে। ব্যাংকগুলোর জন্য LCR ও NSFR মানদণ্ড কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে এবং নিয়মিত স্ট্রেস টেস্টিং বাধ্যতামূলক থাকবে। ব্যাংকগুলোর মূলধন ও সুশাসন জোরদার করা হবে। প্রকৃত ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি রেশিও ন্যূনতম ১২ শতাংশ নিশ্চিত করা হবে। রিলেটেড পার্টি লেন্ডিং, ঋণ এভারগ্রিনিং ও নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতি শূন্য সহনশীলতা থাকবে। একক ঋণগ্রহীতার সীমা কঠোরভাবে মানা হবে এবং বারবার ঋণ পুনঃতফসিলের সুযোগ বন্ধ করে দেউলিয়া সমাধান ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হবে। অর্থঋণ আইন সংস্কার করা হবে এবং মামলাগুলো ৬ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে। প্রতিটি ব্যাংকের বোর্ডে স্বাধীন রিস্ক, অডিট ও রিমুনারেশন কমিটি বাধ্যতামূলক করা হবে। রাজনৈতিক প্রভাবাধীন ঋণ (Political Loan) সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হবে এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বোর্ডকে দলীয় ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা হবে। নিয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে যোগ্যতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে একটি পেশাদার ও স্বাধীন পরিচালনা কাঠামো গড়ে তোলা হবে

ঋণ আদায়ে দীর্ঘসূত্রতা কমাতে আইন প্রয়োগ ও বিচার ব্যবস্থার গতি বাড়ানো হবে। কমার্শিয়াল কোর্টে সময়সীমাবদ্ধ নিষ্পত্তি, ডিফল্ট রেজিস্ট্রি ভিত্তিক দ্রুত প্রক্রিয়া এবং সম্পদ শনাক্ত ও উদ্ধার ব্যবস্থাকে কার্যকর করা হবে। ডিউ প্রসেস বজায় রেখে ফোরক্লোজার ও রিসিভারশিপ সহজ করা হবে। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি, অর্থ পাচারকারী এবং আওয়ামী শাসনামলে গড়ে ওঠা অলিগার্কদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। শীর্ষ আর্থিক অপরাধীদের দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারের মাধ্যমে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। দেশের ভেতরে অবৈধভাবে

অর্জিত সম্পদ জব্দ এবং বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ও সম্পদ ফেরত আনার জন্য আন্তর্জাতিক আইনি সহযোগিতা জোরদার করা হবে। ব্যাংকিং খাতে লুটপাট, ঋণ জালিয়াতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের পূর্ণাঙ্গ ফরেনসিক অডিট পরিচালনা করা হবে।

দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা বাতিল করা হবে। পুনরুদ্ধারকৃত অর্থ জনগণের কল্যাণ, আর্থিক খাত সংস্কার ও সামাজিক খাতে বিনিয়োগে ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। একই সঙ্গে শৃঙ্খলার ভেতরে অন্তর্ভুক্তিমূলক ঋণ নিশ্চিত করা হবে।

ভবিষ্যতের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ফিনটেক ও ওপেন ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। API ভিত্তিক ওপেন ব্যাংকিং, ই-KYC, ডিজিটাল অনবোর্ডিং ও রিয়েল টাইম পেমেন্ট সিস্টেম চালু করা হবে। একই সঙ্গে সাইবার নিরাপত্তা, ডেটা গোপনীয়তা ও গ্রাহকের সম্মতির ক্ষেত্রে কঠোর মানদণ্ড বজায় রাখা হবে। নতুন উদ্ভাবন পরীক্ষার জন্য রেগুলেটরি স্যান্ডবক্সে পাইলট প্রকল্প চালু করে সফল উদ্যোগগুলো ধাপে ধাপে বড় পরিসরে নেওয়া হবে।

পুঁজিবাজার সংস্কার

টেকসই প্রবৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য শক্তিশালী পুঁজিবাজার অপরিহার্য। আমরা ব্যাংক ঋণের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের প্রধান উৎস হিসেবে পুঁজিবাজারকে গড়ে তুলতে চাই। আমাদের লক্ষ্য আগামী পাঁচ বছরে বাজার মূলধন ও GDP এর অনুপাত ৫০ শতাংশে উন্নীত করা এবং "বন্ড মার্কেট ফার্স্ট" কৌশলের মাধ্যমে অবকাঠামো, কর্পোরেট সম্প্রসারণ ও সবুজ রূপান্তরে টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করা। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকনির্ভরতা কমিয়ে ধাপে ধাপে বন্ড, সুকুক ও রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্টস (REITs)–এর মাধ্যমে পুঁজিবাজারকেন্দ্রিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় রূপান্তর করা হবে।

এই লক্ষ্য অর্জনের ভিত্তি হলো শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক সুশাসন। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (BSEC) প্রয়োগ ক্ষমতা জোরদার করা হবে, যাতে ইনসাইডার ট্রেডিং, বাজার কারসাজি ও কৃত্রিম দাম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যায়। আধুনিক ফরেনসিক অ্যানালিটিক্স ও প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি চালু করা হবে এবং জরিমানাসহ শাস্তিমূলক পদক্ষেপকে সময়সীমাবদ্ধ করা হবে। দীর্ঘদিনের মামলার জট কমাতে আলাদা নিষ্পত্তি বেঞ্চ চালু করা হবে। তালিকাভুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে নিয়মিত তথ্য প্রকাশ, সম্পর্কিত পক্ষের লেনদেন নিয়ন্ত্রণ, অডিটর রোটেশন ও স্বাধীন পরিচালকদের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করা হবে। তালিকাভুক্ত কোম্পানির অডিট কোয়ালিটি নিশ্চিত করতে অডিট ফার্মের লাইসেন্সিং, পিয়ার রিভিউ ও রিস্ক বেইজড ইনস্পেকশন বাধ্যতামূলক করা হবে। গুরুতর অবহেলা, স্বার্থের সংঘাত বা ইচ্ছাকৃত ভুল প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে অডিটরদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে জরিমানা, সাময়িক স্থগিতাদেশ ও লাইসেন্স বাতিল পর্যন্ত প্রয়োগ করা হবে।

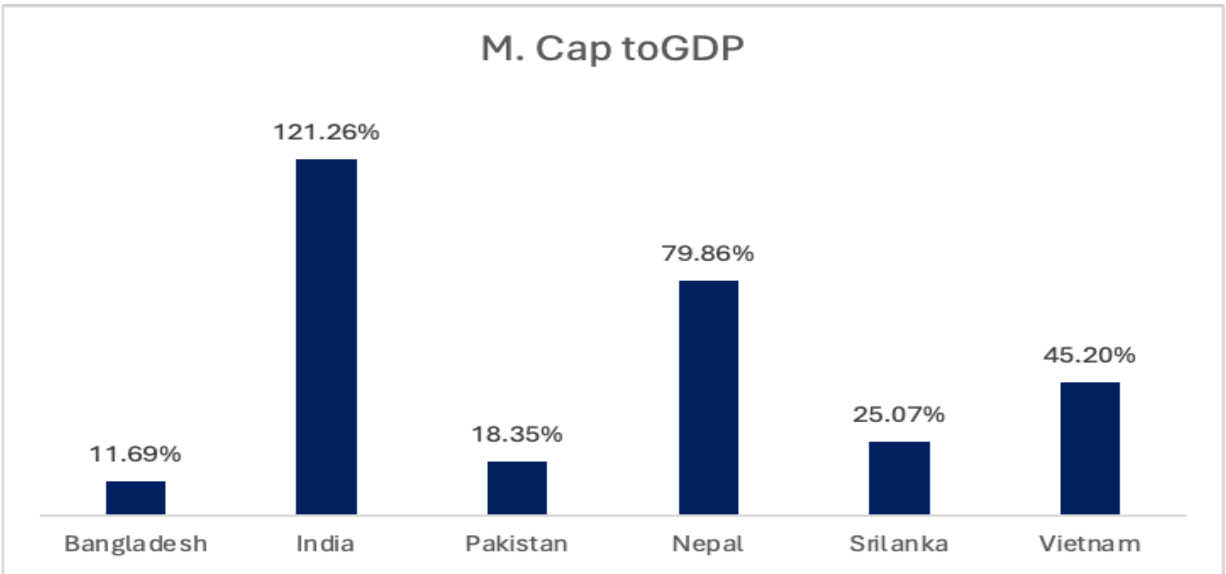

একইভাবে, ক্রেডিট রেটিং এর জন্য স্বচ্ছ মেথডোলজি, পারফরম্যান্স ট্র্যাকিং এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। ধারাবাহিকভাবে ভুল বা বিভ্রান্তিকর রেটিং প্রদান করলে ক্রেডিট রেটিং এর বিরুদ্ধে আর্থিক জরিমানা, কার্যক্রম সীমিতকরণ ও লাইসেন্স স্থগিতের বিধান কার্যকর করা হবে। পুঁজিবাজারে ভালো কোম্পানি আনার জন্য সীমিত সময়ের জন্য কর প্রণোদনা দেওয়া হবে, তবে এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত শেয়ার ফ্রি ফ্লোট, ভালো কর্পোরেট গভর্ন্যান্স ও মানসম্মত হিসাবব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সরকার সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানিগুলোকে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত করে তহবিল সংগ্রহ করবে, যার মাধ্যমে একদিকে সরকারের অর্থায়ন নিশ্চিত হবে এবং অন্যদিকে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য মিউনিসিপাল বন্ড চালু করা হবে এবং যেখানে সুদের হার, নগদ প্রবাহ ও তদারকি ব্যবস্থা হবে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। আমরা বন্ড বাজারের পুনর্জাগরণ করতে চাই। সরকারি বন্ডে কার্যকর সেকেন্ডারি বাজার, স্বচ্ছ বাজারদর নির্ধারণ এবং প্রাইমারি ডিলার ব্যবস্থার সংস্কার করা হবে। কর্পোরেট বন্ডে ইস্যু খরচ কমানো, মানসম্মত রেটিং ব্যবস্থা ও ডিফল্ট হলে দ্রুত সমাধান প্রক্রিয়া চালু করা হবে।বন্ডে বিনিয়োগকে CIB-এর আওতায় এনে ঋণঝুঁকি মূল্যায়নের কাঠামো শক্তিশালী করা হবে এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষায় অর্থঋণ আদালতের মাধ্যমে দ্রুত ও কার্যকর আইনি প্রতিকার নিশ্চিত করা হবে। সুকুক, গ্রিন ও ব্লু বন্ডের জন্য স্পষ্ট কর সুবিধা ও ইমপ্যাক্ট রিপোর্টিং নিশ্চিত করে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা হবে।

নতুন আর্থিক পণ্য চালু হবে যেমন ডিজিটাল কারেন্সি ট্রেডিং, ইনট্রা-ডে নেটিং, শর্ট সেলিং, কমোডিটি ও ডেরিভেটিভস, ইসলামিক বন্ড/সুকুক এবং REITs।Company Act সংস্কার, buyback option চালু, capital market-এর share category আন্তর্জাতিক মানে রূপান্তর, এবং Trust Act ও BSEC Act হালনাগাদ। আধুনিক আর্থিক পণ্য চালুর আগে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ডেরিভেটিভস বা শর্ট সেলিং চালুর আগে ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন, মার্জিন ব্যবস্থা ও অবস্থান সীমা কার্যকর করা হবে। পণ্যের বাজারে ডেলিভারি ভিত্তিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা হবে। রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (REITs)–এর ক্ষেত্রে কর ও স্ট্যাম্প ডিউটিতে সহায়তা দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের সুযোগ

তৈরি করা হবে। ডিজিটাল অ্যাসেট ও টোকেনাইজড সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে সতর্ক অগ্রগতি নেওয়া হবে। কঠোর KYC ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ব্যবস্থা, বিনিয়োগ সীমা ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ রেখে প্রথমে সীমিত পাইলট প্রকল্প চালু করা হবে, সফল হলে ধাপে ধাপে বিস্তার ঘটানো হবে।

আমরা বিনিয়োগকারীর সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেব। এই লক্ষ্যে ইনভেস্টর প্রোটেকশন ফান্ড শক্তিশালী করা হবে, অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য আলাদা ন্যায়পাল থাকবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা হবে। একই সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের আর্থিক শিক্ষা বাড়াতে ডিজিটাল লার্নিং মডিউল, ঝুঁকি ব্যাখ্যা ও সহজ সিমুলেটর চালু করা হবে। বাজারের গভীরতা ও তারল্য বাড়াতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর ভূমিকা কেন্দ্রীয়ভাবে জোরদার করা হবে। মিউচুয়াল ফান্ড, ETF, লাইফ ফান্ড, এন্ডাওমেন্ট ফান্ড, SWF গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন, কর ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো সংস্কার করা হবে। একই সঙ্গে পেনশন ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি ফান্ড যেন সহজে ও নিরাপদভাবে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের জন্য কর ছাড়, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগবান্ধব নিয়ম এবং ঝুঁকিভিত্তিক বিনিয়োগ গাইডলাইন চালু করা হবে। প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ বাজারকে স্থিতিশীল করবে, অতিরিক্ত অস্থিরতা কমাবে এবং দীর্ঘমেয়াদি পুঁজির যোগান নিশ্চিত করবে। আঞ্চলিক সংযোগ জোরদারে সীমিত পরিসরে ডুয়াল ও ক্রস–লিস্টিংয়ের পাইলট উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বৈশ্বিক অর্থনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে উন্নত দেশসমূহে অতিমাত্রায় মুদ্রা সরবরাহ (money printing) ও ঋণমান (credit rating) অবনতির ফলে আন্তর্জাতিক বন্ড বিনিয়োগকারীরা তাদের পোর্টফোলিও ডাইভারসিফিকেশনের জন্য নতুন ও উদীয়মান বাজারের সন্ধানে রয়েছে। আমরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের সরকারি ট্রেজারি বন্ড ও সুকুককে একটি নিরাপদ, লাভজনক ও উদীয়মান বাজারভিত্তিক বিনিয়োগ মাধ্যম হিসেবে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। বৈশ্বিক বন্ড মার্কেটের বিশাল তহবিলের সামান্য অংশও যদি বাংলাদেশে আকর্ষণ করা যায়, তবে তা সরকারের মূলধন সংগ্রহের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবে। এই লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বন্ড সূচকে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিত করা হবে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজ, স্বচ্ছ ও পূর্বানুমেয় প্রবেশ-প্রস্থান ব্যবস্থা (entry & exit mechanism) নিশ্চিত করা হবে। সরকারি বন্ডে বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়লে অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর সরকারের ঋণনির্ভরতা কমবে। এতে বেসরকারি খাতের জন্য তারল্য ও ঋণপ্রবাহ আরও শক্তিশালী হবে। উন্নয়ন অর্থায়নের লক্ষ্যে এনসিপি আন্তর্জাতিক বাজারে, বিশেষ করে GCC অঞ্চলে, একটি Sovereign Sukuk ইস্যু করবে। এর মাধ্যমে অবকাঠামো, জ্বালানি ও টেকসই উন্নয়ন প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পব্যয়ী অর্থায়ন নিশ্চিত করা হবে

ইনসুরেন্স: ঝুঁকি-কভারেজের বিস্তার ও সামাজিক সুরক্ষা নেট

দেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষার জন্য শক্তিশালী ইনসুরেন্স খাত অপরিহার্য। বর্তমান ইনসুরেন্স পেনিট্রেশন মাত্র ০.৪১%; এটি আগামী পাঁচ বছরে আমরা ধাপে ধাপে ৫% পর্যন্ত উন্নীত করা হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের মূল ভিত্তি হলো বিশ্বাসযোগ্যতা, উপযোগী পণ্য এবং দ্রুত দাবিনিষ্পত্তি। এই লক্ষ্যে গভর্ন্যান্স ও বোর্ড রিফর্ম নিশ্চিত করা হবে। প্রতিটি বিমা কোম্পানিতে বাধ্যতামূলকভাবে স্বাধীন পরিচালক, অ্যাকচুয়ারিয়াল বিশেষজ্ঞ ও রিস্ক কমিটি

থাকবে। বিনিয়োগ নীতি (IPS) এ ডিউরেশন ম্যাচিং, অ্যাসেট কোয়ালিটি এবং কনসেন্ট্রেশন লিমিট কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে। রিলেটেড পার্টি বিনিয়োগে শূন্য সহনশীলতা বজায় রাখা হবে। এছাড়াও অডিটর রোটেশন, IT অডিট এবং অ্যাকচুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশন অডিট বাধ্যতামূলক করা হবে, যাতে অডিট ও রেটিং প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।

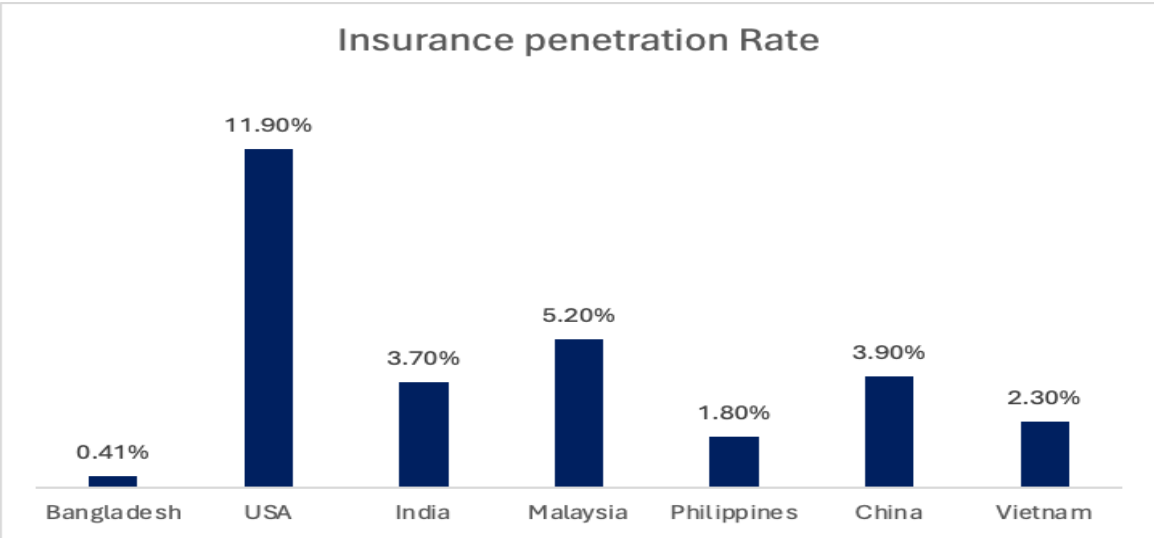

মাইক্রো-ইনসুরেন্সকে কৃষি, পশুপালন ও জলবায়ু ঝুঁকি (ইনডেক্স-ভিত্তিক) ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা হবে, যাতে অনানুষ্ঠানিক খাতের পরিবারেরাও সুরক্ষায় আসে। স্বাস্থ্যবীমায় নেটওয়ার্ক কেয়ার, ক্যাশলেস ক্লেইম এবং ফ্রড ডিটেকশন ব্যবস্থা থাকবে। ক্রিটিকাল ইলনেস বা আয়ের সুরক্ষাপণ্য সহজবোধ্য ও সাশ্রয়ী হবে। সাইবার ঝুঁকি, SME বিজনেস ইন্টারাপশন এবং শহরের দুর্যোগ ঝুঁকিও কাভার করা হবে।

Bancassurance ও ডিজিটাল ডিস্ট্রিবিউশন জোরদার করা হবে। ব্যাংক চ্যানেলে স্কেল আপের সুযোগ থাকবে কিন্তু এক্ষেত্রে মিসসেলিং প্রতিরোধ নিশ্চিত করা হবে। Insurtech ব্যবহার করে eKYC, ইনস্ট্যান্ট আন্ডাররাইটিং এবং টেলিম্যাটিক্স/ওয়্যারেবল ভিত্তিক প্রাইসিং হবে এবং যেখানে কনজিউমারের সম্মতি ও প্রাইভেসি রক্ষা করা হবে। স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বজায় রাখতে এজেন্ট কমিশন স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা হবে। দাবি পরিশোধ প্রক্রিয়া ১০০% দ্রুত করা হবে। সাধারণ দাবি ৭-১৪ দিনের মধ্যে, জটিল দাবি ৩০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে। ডিজিটাল ক্লেইম-ট্র্যাকিং, সরল চেকলিস্ট এবং শক্তিশালী ফ্রড ডিটেকশন থাকবে। দাবির প্রত্যাখ্যানের হার ও কারণ প্রকাশ বাধ্যতামূলক হবে।

সলভেন্সি ও গ্রুপ সুপারভিশন জোরদার করা হবে। RBC ফ্রেমওয়ার্ক, স্ট্রেস টেস্ট এবং অর্থনৈতিক সিনারিও বিশ্লেষণ বাধ্যতামূলক করা হবে। ব্যাংক ও বিমা এক গ্রুপে থাকলে ফায়ারওয়াল এবং রিলেটেড পার্টি সীমা কার্যকর থাকবে।

রি-ইনসুরেন্স ও জাতীয় কভারেজ সম্প্রসারিত হবে। আন্তর্জাতিক রি-ইনসুরার চুক্তি উন্নয়ন, ক্যাটাস্ট্রফ বন্ড/সোয়াপ এবং রাষ্ট্র সমর্থিত ডিজাস্টার রিস্ক ফাইন্যান্সের সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।

আর্থিক সাক্ষরতা ও নীতি সিঙ্ক নিশ্চিত করা হবে। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে ঝুঁকি সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মাইক্রোলার্নিং মডিউল চালু করা হবে। কৃষক, নারী উদ্যোক্তা ও গিগ ওয়ার্কারদের জন্য কাস্টম মডিউল থাকবে। স্বাস্থ্য, কৃষি এবং MSME নীতির সঙ্গে ইনসুরেন্স লিঙ্কড স্কিম সমন্বয় করা হবে।

ডেটা স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

ন্যায়সংগত নীতি প্রণয়ন, কার্যকর সম্পদ বণ্টন এবং নাগরিক-রাষ্ট্রের পারস্পরিক বিশ্বাস নির্মাণের জন্য ডেটা স্বচ্ছতা একটি মৌলিক শর্ত। তাই আমরা ডেটা গভর্ন্যান্সকে উন্নয়ন রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য মনে করি। বাংলাদেশে মধ্য-১৯৯০ দশক থেকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা FY2012-13 এরপর তীব্র হয়। প্রকাশিত শ্বেতপত্র অনুযায়ী FY2013-FY19 সময়ে ঘোষিত প্রবৃদ্ধি বাস্তবের তুলনায় গড়ে ৩.৫ শতাংশ পয়েন্ট বেশি দেখানো হয়েছে। একই সময়ে রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অতিরঞ্জন, মুদ্রাস্ফীতি কৃত্রিমভাবে কম দেখানো, আর টাকার অবমূল্যায়ন চেপে রেখে বছরে গড়ে প্রায় ১৬ বিলিয়ন ডলার পাচার করা হয়েছে। এসময় ৬-৯% সুদের সীমা আরোপ করে ঋণবাজার বিকৃত করা হয় এবং এর ফলে ঝুঁকি মূল্যায়ন ও সঞ্চয় ব্যবস্থায় মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে। এসময় এনপিএল মানদণ্ড বৈশ্বিক চর্চা থেকে দূরে ছিল এবং Tier-1 ও Tier-2 ক্যাপিটাল ক্রসিংয়ের মাধ্যমে CRAR কৃত্রিমভাবে ম্যানেজ করা হয়। এসবই আগের শাসনামলে রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির স্পষ্ট প্রতিফলন।

তাই আমরা ডেটার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা ও মানদণ্ড নিশ্চিত করব। জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থাকে আইনগত স্বাধীনতা, স্বতন্ত্র বাজেট এবং জনবল নিয়োগে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। IMF-SDDS ও জাতিসংঘের Fundamental Principles এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডেটা ডিকশনারি, মেটাডাটা, পদ্ধতিগত নোট ও রিভিশন ক্যালেন্ডার বাধ্যতামূলক করা হবে। GDP এর Supply-Use টেবিল, রিবেসিং, চেইন লিঙ্কিং এবং সেক্টরাল গ্রানুলারিটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

নীতিনির্ধারণকে সমসাময়িক রাখতে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি সূচক ও ওপেন API চালু করা হবে। শ্রমবাজার (payroll proxy, job postings, LFPR), granular CPI, হাই ফ্রিকোয়েন্সি কর্মসংস্থান সার্ভে, মোবিলিটি, বিদ্যুৎ ব্যবহার, পোর্ট থ্রুপুট ও পেমেন্ট সুইচ ভলিউম সব ডেটা ওপেন API এর মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য হবে। একই সঙ্গে ডেটা ল্যাব স্থাপন করে স্যানিটাইজড মাইক্রোডেটা বিশ্ববিদ্যালয়, স্টার্টআপ ও থিংক ট্যাঙ্কের গবেষণায় উন্মুক্ত করা হবে।

ভুলের স্বীকারোক্তি ও রিভিশন নীতিমালা প্রাতিষ্ঠানিক করা হবে। রিভিশন অপরাধ নয়, অপরাধ হলো তা আড়াল করা। প্রথম প্রকাশ, প্রাথমিক সংশোধন, চূড়ান্ত সংশোধন এই ধারাবাহিকতা, সময়সীমা ও সংশোধনের কারণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হবে। মুদ্রাস্ফীতির ঝুড়ি নিয়মিত আপডেট এবং হেডোনিক অ্যাডজাস্টমেন্টে পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মেট্রিক আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক প্রকাশ পাবে। জিনি ও পাম রেশিও, MPI, জেন্ডার গ্যাপ, আঞ্চলিক বৈষম্য সূচক, ডিসএ্যাবিলিটি ইনক্লুশন স্কোর, নীচের ২০ শতাংশের বাস্তব আয় বৃদ্ধি ও সেবা অ্যাক্সেসিবিলিটি সূচকগুলো নিয়মিত প্রকাশ করা হবে। আন্তঃসরকারি অর্থ হস্তান্তর হবে অবজেক্টিভ ফর্মুলা ভিত্তিক এবং জনসংখ্যা, দরিদ্রতার গভীরতা, ভৌগোলিক ঝুঁকি ও সেবার ঘাটতির নিরপেক্ষ মানদণ্ডে।

সামাজিক সুরক্ষায় লক্ষ্যভিত্তিকতা জোরদার করা হবে। NID ভিত্তিক সিঙ্গেল সোশ্যাল রেজিস্ট্রি চালু করে অপ্রয়োজনীয় ডুপ্লিকেশন ও লিকেজ বন্ধ করা হবে। AI অ্যাসিস্টেড টার্গেটিং ব্যবহৃত হবে, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে মানবিক দায়িত্ব অটুট থাকবে। বাংলাদেশে সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে এক্সক্লুশন এবং ইনক্লুশন এরর প্রবল। যেমন, প্রতিবন্ধী ভাতার ক্ষেত্রে ইনক্লুশন এরর প্রায় ৫০% এরও বেশি। সিঙ্গেল সোশাল রেজিস্ট্রি তৈরি হলে এই হার কমে আসবে। Direct Benefit Transfer (DBT) সম্প্রসারণের মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগী ও ঘুষের সুযোগ কমানো হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ওপেন ড্যাশবোর্ড ও Outcome–Based Budgeting (OBB) ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় লার্নিং আউটকাম, ড্রপআউট, শিক্ষক উপস্থিতি ও ইন্সপেকশন রিপোর্ট ওপেন ডেটা হিসেবে প্রকাশ পাবে। স্বাস্থ্যখাতে হাসপাতালের OP/IP, বেড অকুপেন্সি, ওষুধের প্রাপ্যতা ও আউটকাম ইনডিকেটর জেলা-ভিত্তিক ড্যাশবোর্ডে দেখা যাবে। নাগরিকের অধিকার ও অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিক করা হবে। ডিজিটাল RTI চালু করে সময়সীমাবদ্ধ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা হবে। নীতিতে নাগরিকের কণ্ঠস্বর দৃশ্যমান রাখতে সিটিজেন অডিট, ওপেন বাজেট সার্ভে ও পার্টিসিপেটরি প্ল্যানিং স্থানীয় সরকার পর্যায়ে বাধ্যতামূলক করা হবে। ভৌগোলিক সমতা নিশ্চিত করতে অঞ্চলভিত্তিক কৌশল নেওয়া হবে। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণ–পূর্ব উপকূল ও চরাঞ্চলে যাতে পুরোনো বৈষম্যের পুনরুৎপাদন বন্ধে “ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফার্স্ট” এর বদলে “সার্ভিস ফার্স্ট” নীতি অনুসরণ করে স্কুল, স্বাস্থ্য, ডিজিটাল কানেক্টিভিটি ও স্কিলসে অগ্রাধিকার দেওয়া ।

৫। তারুণ্য ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি

বাংলাদেশ আজ একটি ঐতিহাসিক demographic dividend এর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দেশের মানুষের মধ্যক (median) বয়স প্রায় ২৬ বছর। এই বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠী যদি নীতি-প্রণয়ন, শিক্ষা, অর্থনীতি, শিল্প ও সংস্কৃতির নেতৃত্বে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে পারে, তবেই বাংলাদেশ দ্রুত সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারবে। সম্ভাবনার পাশাপাশি একটি নতুন চ্যালেঞ্জও স্পষ্টভাবে সামনে আসছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), রোবোটিক্স ও অটোমেশনের দ্রুত বিস্তার উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বাড়ালেও অনেক ক্ষেত্রেই প্রচলিত কর্মসংস্থানের ধরনকে পরিবর্তন করছে এবং মানবশ্রমের চাহিদা কমিয়ে দিচ্ছে। তাই আমরা কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে শুধু সংখ্যা নয়, বরং দক্ষতা রূপান্তর, নতুন কাজের ধরন তৈরি এবং প্রযুক্তির সাথে মানবসম্পদের সহাবস্থান নিশ্চিত করার মানদণ্ডে দেখতে চাই।

গণতন্ত্রকে আরও অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল করতে আমরা ভোটাধিকারের বয়স ১৬ বছর করব। আমাদের এই অবস্থান জাতীয় নাগরিক পার্টির পক্ষ থেকে সংস্কার কমিশনে দেয়া প্রস্তাবনা থেকেই। সরকারি সিদ্ধান্ত সবথেকে বেশি প্রভাব ফেলে তরুণদের জীবনযাত্রার উপরেই। তাই, তরুণরা যত দ্রুত নাগরিক সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবে, তত বেশি গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা তৈরি হবে। এছাড়া বাংলাদেশে ১৬-১৮ বছরের তরুণদের শিক্ষা, সিভিক ও ডিজিটাল লিটারেসি একজন গড় ভোটারের থেকে কম নয়, বরং অনেক অংশেই বেশি। অস্ট্রিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনাসহ বিভিন্ন দেশে জাতীয় নির্বাচনে ভোট প্রদানের বয়স বহু বছর ধরেই ১৬ বছর এবং যুক্তরাজ্যেও আগামী নির্বাচনে ১৬ বছর বয়সীরা ভোট দিতে পারার জন্য প্রক্রিয়া চলছে।

তরুণদের কণ্ঠকে প্রাতিষ্ঠানিক ও কার্যকর করতে আমরা Youth Civic Council বা YCC গঠন করব, যা ইউনিয়ন ও উপজেলা থেকে শুরু করে জেলা এবং জাতীয় স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। এই কাউন্সিলে ৫০ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব বাধ্যতামূলক হবে এবং আদিবাসী, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত কোটা থাকবে। YCC নীতি প্রণয়নে মতামত দেবে, বার্ষিক বাজেটে যুবদের জন্য বরাদ্দ মূল্যায়ন করবে, নাগরিক সেবার মান যাচাই করবে এবং নতুন আইন প্রস্তাবে তরুণদের মতামত যুক্ত করবে। প্রতি বছর 'Youth State of the Nation' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে এবং সংসদের স্থায়ী কমিটিতে নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক ব্রিফিং প্রদান করা হবে।

সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতাকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিতে রূপ দিতে আমাদের লক্ষ্য Youth Cultural Fellowship চালু করা। এর মাধ্যমে সৃজনশীল স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ-বিরোধীতা, সংস্কৃতিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং তরুণদের মানসিক সুস্থতা জোরদার করায় গুরুত্ব দেয়া হবে। চলচ্চিত্র, সংগীত, নাটক, নকশা ও ডিজাইন, গেমিং ও অ্যানিমেশন, সাহিত্য এবং লোকসংস্কৃতির মতো খাতে গ্র্যান্ট, মেন্টরশিপ ও রেসিডেন্সি দেওয়া হবে। জেলা পর্যায়ে কালচার হাব স্থাপন করা হবে, যেখানে কপিরাইট ও রয়্যালটি বিষয়ে আইনি সহায়তা পাওয়া যাবে এবং নারীদের জন্য নিরাপদ সৃষ্টিশীল পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। আমাদের লক্ষ্য পাঁচ বছরে মোট ৩,০০০

ফেলো তৈরি, যার মধ্যে ৫০ শতাংশ নারী এবং অন্তত ৩০ শতাংশ সুবিধাবঞ্চিত এলাকা থেকে আসবে। এর ফল হিসেবে বাজারযোগ্য সৃজনশীল কাজ, নতুন স্টার্টআপ এবং আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও উৎসবে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।

এই সব কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ক্যাবিনেট সেলের অধীনে National Youth Secretariat গঠন করা হবে। এটি শিক্ষা, সংস্কৃতি, নির্বাচন ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবে। অভিযোগ, পরামর্শ, বাজেট ট্র্যাকিং এবং ফেলোশিপ আবেদন করার জন্য একটি সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু থাকবে। প্রত্যন্ত অঞ্চল, চর ও পার্বত্য এলাকায় বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হবে এবং প্রশিক্ষণ কনটেন্ট বাংলা ও স্থানীয় ভাষায়, পাশাপাশি প্রতিবন্ধীবান্ধব উপকরণে সরবরাহ করা হবে।

শিশু-কিশোর ও তরুণ প্রজন্মের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, চিত্তবিনোদন, নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে খেলাধুলা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। খেলাধুলার জন্য সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে নেওয়া উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম প্রকল্পকে বিস্তৃত করে দেশের সব উপজেলায় দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে এবং জেলা পর্যায়ের বিদ্যমান স্টেডিয়ামসমূহ আধুনিকায়ন করা হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জেলা পর্যায়ে নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি ৮টি বিভাগে ৮টি মাল্টি-পারপাস স্পোর্টস হাব নির্মাণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হবে। ঢাকার পূর্বাচলে ফুটবলের জন্য বিশ্বমানের একটি ডেডিকেটেড স্টেডিয়াম এবং একটি অলিম্পিক পার্ক নির্মাণ করা হবে, যেখানে অলিম্পিকের সব ডিসিপ্লিনের জন্য আন্তর্জাতিক মানের সুবিধা থাকবে। খেলাধুলাকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে ক্রীড়াঙ্গণকে রাজনীতিমুক্ত ঘোষণা করা হবে। নিয়মিত প্রতিভা বিকাশ কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ ও ক্যালেন্ডারভিত্তিক টুর্নামেন্টের মাধ্যমে উপজেলা থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ক্রীড়াবিদ গড়ে তোলা হবে এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে বিকেএসপির মানোন্নয়নসহ নতুন বিশেষায়িত বিকেএসপি প্রতিষ্ঠা করা হবে। ক্রীড়াঙ্গণে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক মানের বাংলাদেশ স্পোর্টস ইনস্টিটিউট সম্পন্ন করা হবে এবং অবকাঠামোর পাশাপাশি উন্নত ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা ও মানসম্মত প্রশিক্ষণের কার্যকর কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে।

মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান, গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে প্রায় ৬০ থেকে ৮০ হাজার শিক্ষকের ঘাটতি আছে। আমরা প্রতি বছর ১০ হাজার সদ্য গ্রাজুয়েটকে Graduate Teaching Fellowship বা GTF কর্মসূচির মাধ্যমে ১-২ বছর মেয়াদে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ দেবো। জাতীয় পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ, যোগ্যতা যাচাই এবং ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের প্রশিক্ষণের পর উপজেলা-ভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী পোস্টিং দেওয়া হবে। এই ফেলোশিপের জন্য আবেদন করা যাবে চতুর্থ বর্ষে থাকাকালীন সময়েই, ফলে স্নাতক পাশ করার সাথে সাথে চাকরির নিশ্চয়তা থাকবে। প্রতিটি ফেলোর জন্য একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক মেন্টর থাকবেন এবং খণ্ডকালীন চাকরির মেয়াদ শেষে স্থায়ী নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রতি বছর সুবিধাবঞ্চিত পরিবার ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের চার হাজার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক পাঁচ হাজার টাকা করে শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হবে, যার মেয়াদ সর্বোচ্চ চার বছর। অন্তত ৫০ শতাংশ বৃত্তি নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। স্নাতক শেষে কমপক্ষে দুই বছর GTF-এ কাজ করার শর্ত থাকবে, অন্যথায় সুদমুক্তভাবে বৃত্তির অর্থ ফেরত দেয়া যাবে। একসঙ্গে

বছরে ১৬,০০০ শিক্ষার্থী এই বৃত্তির আওতায় আসবে। এই বৃত্তি কর্মসূচির জন্য বাৎসরিক আনুমানিক বাজেট ধরা হয়েছে ১০০ কোটি টাকা।

আমাদের লক্ষ্য পাঁচ বছরে দেশে অন্তত এক কোটি সম্মানজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টির। এতে বছর প্রতি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে গড়ে প্রায় ২.৬৫%। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মসংস্থান রেজিস্ট্রি চালু করা হবে, যেখানে সব বেকার ও আংশিক নিয়োজিত মানুষ নিবন্ধিত হবে এবং দেশি-বিদেশি নিয়োগদাতাদের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্কিল ম্যাপিং, ডিজিটাল সিভি, জব-ম্যাচিং অ্যালগরিদম, নিরাপদ ডিজিটাল পেমেন্ট এবং অভিযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি সমন্বিত চাকরি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এছাড়া তরুণ উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগকারীদের সাথে যুক্ত হওয়া সহজ করতে একটি স্টার্টআপ ডেটাবেজ তৈরি করা হবে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের খাতভিত্তিক বণ্টন ছিল কৃষিতে ৪৬ শতাংশ, সেবা খাতে ৩৭ শতাংশ এবং শিল্প খাতে ১৭ শতাংশ। মোট নিয়োজিত জনশক্তি প্রায় ৬৯.১১ মিলিয়ন। একই সময়ে প্রায় দেড় থেকে দুই কোটি তরুণ NEET অবস্থায় রয়েছে।

কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্পে আগামী পাঁচ বছরে প্রায় ২৫ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। প্রচলিত কৃষির পাশাপাশি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কোল্ড স্টোরেজ, প্যাকেজিং, মান নিয়ন্ত্রণ এবং রপ্তানিমুখী কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়ানো হবে। আধুনিক সেচ, উচ্চমূল্যের ফসল, বীজ উৎপাদন এবং এগ্রো-টেক সেবার মাধ্যমে গ্রামভিত্তিক তরুণ উদ্যোক্তা তৈরি করা হবে। কৃষি লজিস্টিক্স, পরিবহন ও বাজার সংযোগ জোরদার করে মাঠ থেকে বাজার পর্যন্ত মূল্য শৃঙ্খলে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে, বিশেষ করে নারী ও যুবদের জন্য।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, নির্মাণ সামগ্রী, প্লাস্টিক, প্যাকেজিং, আসবাবপত্র এবং ইলেকট্রনিক পণ্যে স্থানীয় কারখানা ও ওয়ার্কশপ সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রায় ৩০ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।সরকারি ক্রয়ে SME set-aside নীতি চালু করে স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের জন্য বাজার নিশ্চিত করা হবে। বিশেষভাবে নারী ও যুব-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগকে সহজ ঋণ, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। জামানত সংকট দূর করতে সরকার বা জয়েন্ট ভেঞ্চার (JV) গ্যারান্টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বল্পসুদে অর্থায়ন নিশ্চিত করা হবে, মেটেরিয়াল সিকিউরিটি ছাড়াই SME বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করা হবে। MSME ও কৃষি খাতে ক্যাশফ্লো ভিত্তিক ঋণ, ডিজিটাল লেনদেন তথ্য অনুযায়ী বিকল্প ক্রেডিট স্কোর, সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স এবং ইনভয়েস ডিসকাউন্টিং সম্প্রসারিত করা হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে SME-দের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন ও সরাসরি বিতরণ করা হবে। স্টার্টআপ হাইপের বদলে বাস্তব ও টেকসই SME খাতেই নীতিগত ফোকাস থাকবে। নারী উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিল নিশ্চিত করা হবে। ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমে ঝুঁকি ভাগাভাগি নিশ্চিত করা হবে, তবে অপব্যবহার বন্ধ করতে স্পষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করা হবে। নারী উদ্যোক্তা ও তরুণ স্টার্টআপদের জন্য ডিজিটাল ফার্স্ট ব্যাংকিং পণ্য চালু করা হবে, যাতে সহজ, দ্রুত ও স্বচ্ছ লেনদেন সম্ভব হয়। SME ব্যবসার নিবন্ধন খরচ হ্রাস করা হবে এবং প্রথম ৫ বছরে করমুক্তি প্রদান করা হবে, যাতে নতুন উদ্যোগ গড়ে ওঠা ও সম্প্রসারণ সহজ হয়।

ডিজিটাল অর্থনীতিতে প্রায় ১৫ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। BPO, ফ্রিল্যান্সিং, রিমোট কাজ, কনটেন্ট মডারেশন, ডেটা অ্যানোটেশন, কাস্টমার সাপোর্ট এবং সাইবারসিকিউরিটি সহায়তা খাতে কাজ বাড়ানো হবে। দেশের ৬৪ জেলায় ডিজিটাল হাব স্থাপন করে হাই-স্পিড ইন্টারনেট, কো-ওয়ার্কিং স্পেস, ডিজিটাল পেমেন্ট ও জব-লিঙ্কড প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। নারী ও শিক্ষার্থীদের জন্য পার্ট-টাইম ও ফ্লেক্সিবল কাজের সুযোগ বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে।

নির্মাণ, আবাসন ও অবকাঠামো খাতে প্রায় ১৫ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্প, নগর ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে স্থানীয় শ্রম ও উপকরণ ব্যবহারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। স্থানীয় কনটেন্ট নীতির মাধ্যমে রাজমিস্ত্রি, টেকনিশিয়ান, সুপারভাইজার এবং সহায়ক কর্মীদের জন্য ব্যাপক কাজের সুযোগ তৈরি হবে।

সরকারি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেবল বিদ্যমান শূন্যপদ পূরণই নয়, বরং সম্পূর্ণ ডিমান্ড ও সাপ্লাইয়ের পুনর্মূল্যায়ন (re-assessment) করা হবে। কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থায় কী ধরনের মানবসম্পদের বাস্তব চাহিদা রয়েছে, কোন কাজগুলো অতিরিক্ত জনবল ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব এবং কোথায় দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে এই বিষয়গুলো খাতভিত্তিকভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। এই পুনর্মূল্যায়নের ভিত্তিতেই সরকারি নিয়োগ কাঠামো আধুনিক ও বাস্তবসম্মত করা হবে। একই সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), অটোমেশন ও ডিজিটাল সেবার প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে সরকারি কাজের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা (efficiency) মূল্যায়ন করা হবে। কোন কাজগুলো প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত ও কম জনবল দিয়ে করা সম্ভব, এবং কোন সেবায় মানবিক দক্ষতা, মাঠপর্যায়ের উপস্থিতি ও সিদ্ধান্তগ্রহণ অপরিহার্য এই পার্থক্য স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হবে। AI ব্যবহারের ফলে যেখানে সময় ও ব্যয় সাশ্রয় হবে, সেখানে জনবল সংকোচনের পরিবর্তে সেই সক্ষমতা নতুন সেবা, মানোন্নয়ন ও নাগরিক-কেন্দ্রিক কার্যক্রমে পুনঃনিয়োগ করা হবে। এই পুনর্গঠিত কাঠামোর মধ্যেই আগামী পাঁচ বছরে সরকারি খাতে মোট ১৪ লাখ সম্মানজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। জনসংখ্যার বাস্তব চাহিদা ও সেবার মান বিবেচনায় নিয়ে সরকারিভাবে নার্স, চিকিৎসক, পুলিশ ও অন্যান্য পাবলিক সার্ভেন্ট নিয়োগের সংখ্যা পুনর্নির্ধারণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সেরা চর্চা ও বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুসরণ করা হবে, যেমন প্রতি ১,০০০ জন মানুষের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক নার্স, পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মী নিশ্চিত করার মডেল। দেশের জনসংখ্যা, নগর গ্রাম বিভাজন, বয়স কাঠামো ও সেবা চাহিদা বিশ্লেষণ করে খাতভিত্তিক ডিমান্ড নিরূপণ করা হবে এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পিত ও পর্যায়ক্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ তৈরি করা হবে। এর ফলে একদিকে নাগরিক সেবার মান ও প্রবেশগম্যতা বাড়বে, অন্যদিকে বাস্তব চাহিদাভিত্তিকভাবে সম্মানজনক সরকারি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও প্রশাসনে অনুমোদিত শূন্যপদ দ্রুত পূরণ করা হবে এবং নতুন সেবা ডেলিভারি ইউনিট গড়ে তোলা হবে। শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী, প্রশাসনিক সহায়ক এবং ডিজিটাল সেবা প্রদানকারী হিসেবে তরুণদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, যাতে সরকারি সেবার মান বাড়ার পাশাপাশি বেকারত্ব কমে। সরকারি চাকরিতে নিয়োগে অস্বচ্ছতা ও হয়রানি বন্ধে সেক্টরভিত্তিক একীভূত ও কেন্দ্রীয় পরীক্ষা চালু করা হবে। পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর চাকরি পাওয়া যাবে। এতে করে বারবার পরীক্ষা, অতিরিক্ত খরচ ও হয়রানি বন্ধ হবে।

ক্রীড়া খাতে প্রায় ১ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা, কোচিং, ফিটনেস ট্রেনিং, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, খেলাধুলাভিত্তিক পর্যটন এবং মিডিয়া কভারেজে নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়ন করে স্থানীয় তরুণদের জন্য পেশাদার ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট ক্যারিয়ার গড়ে তোলা হবে।

এছাড়া, প্রতি বছর ন্যূনতম ১৫ লাখ নিরাপদ ও সম্মানজনক প্রবাসী কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে। ভাষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ, প্রি-ডিপার্চার সাপোর্ট, স্বল্প খরচে রেমিট্যান্স সেবা এবং যুব অধিদপ্তরের আওতায় দেশব্যাপী আধুনিক ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য IELTS, GRE/GMAT/SAT পরীক্ষায় অংশগ্রহণে সহজ শর্তে শিক্ষাঋণ প্রদান করা হবে। মধ্যপ্রাচ্য, জাপান ও কোরিয়ার শ্রমবাজারকে লক্ষ্য করে প্রফেশনাল ইংরেজি ও বিদেশি ভাষা, অফিস ম্যানেজমেন্ট ও বেসিক আইটির পাশাপাশি আইটি, স্বাস্থ্যসেবা, কেয়ারগিভিং, নার্সিং, লজিস্টিক্স, হসপিটালিটি ও প্রকৌশল খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উচ্চ আয়ের নিশ্চয়তা দিতে আমরা কারিগরি শিক্ষাকে ঢেলে সাজাবো। এই লক্ষ্যে দেশজুড়ে আধুনিক ট্রেড স্কুল স্থাপন এবং ব্যাপকহারে 'শিক্ষানবিশ' (Apprenticeship) কর্মসূচি চালু করা হবে। এর লক্ষ্য হলো গতানুগতিক শ্রমিকের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দক্ষ 'ট্রেডসপারসন' বা কারিগর, যেমন সার্টিফাইড ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, ওয়েল্ডার ও অটো-মেকানিক তৈরি করা। এই দক্ষ জনশক্তি একদিকে যেমন দেশের শিল্প ও আবাসন খাতে উন্নত সেবা নিশ্চিত করবে, তেমনি বিদেশের শ্রমবাজারে সাধারণ শ্রমিকের পরিবর্তে 'স্কিলড টেকনিশিয়ান' হিসেবে উচ্চ বেতনে কাজ করার সুযোগ পাবে। ফলে শ্রমবাজারের গুণগত পরিবর্তন ঘটবে এবং জাতীয় রেমিট্যান্স প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

৬। আধুনিক শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন

আমরা ভবিষ্যতের উদ্ভাবন, শিল্পায়ন ও অর্থনীতির জন্য প্রস্তুত একটি দক্ষ, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলব। শিক্ষা পণ্য নয়, অধিকার। বিজ্ঞান, গণিত, প্রকৌশল ও চিকিৎসা শিক্ষায় শক্ত ভিত তৈরিতে আমাদের থাকবে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা। আমাদের ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চার পাশাপাশি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নৈতিকতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুনাগরিক তৈরি করবে। শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং উচ্চশিক্ষার মূল লক্ষ্য হবে মানসম্পন্ন গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান সৃষ্টি। এই লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করা হবে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ ও অংশীজনদের সমন্বয়ে একটি ভবিষ্যৎমুখী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে। এই কমিশনের সুপারিশক্রমে বাংলা মাধ্যম, মাদ্রাসা, ও ইংরেজি মাধ্যমসহ বিদ্যমান সকল ধরনের শিক্ষার মাধ্যম ও পদ্ধতিগুলোর একটি যৌক্তিক সমন্বয় করব এবং আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির চাহিদার সাথে সংগতি রেখে জাতীয় পাঠ্যক্রমকে আধুনিকায়ন করব। কওমি শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা, ইসলামি গবেষণা, ব্যাংকিং, শিক্ষা, গণমাধ্যম ও প্রযুক্তি খাতে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে।

কর–জিডিপি অনুপাতের বাস্তবতা ও রাজস্ব সক্ষমতার সঙ্গে সমন্বয় রেখে ধাপে ধাপে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে জিডিপির কমপক্ষে ৩ শতাংশে উন্নীত করা হবে, এবং দীর্ঘমেয়াদে ৬ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য থাকবে। এ লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হবে, যাতে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ টেকসই, পরিকল্পিত ও ফলপ্রসূ হয়। সকল সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বেতন পারিবারিক আয়ের উপর নির্ভর করবে। এতে করে শিক্ষার সুযোগে ন্যায্যতা ও প্রবেশগম্যতা বাড়বে এবং আরও বেশি মানুষ ট্যাক্স রিটার্ন জমার আওতায় আসবেন। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি কাঠামো তৈরি করা হবে। এই কাঠামোর অধীনে ক্রেডিট প্রতি সর্বোচ্চ ফি নির্ধারণ, ফি এর পরিমাণ শিক্ষার কোয়ালিটি ইনডিকেটরের সাথে লিঙ্ক করা, ফি পরিশোধের ইন্সটলমেন্ট বৃদ্ধি, বাৎসরিক ফি বৃদ্ধির লিমিট, এবং কমপক্ষে ৫% শিক্ষার্থীকে মেধা ও পরিবারের আয়ের ভিত্তিতে বৃত্তির আওতায় নিয়ে আসা হবে।

বিভিন্ন জাতিস্বত্তার শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিজ-নিজ মাতৃভাষা শিক্ষার সুযোগ করা হবে। বিভিন্ন জাতিস্বত্তার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় প্রয়োজনের ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে অন্তত পাঁচটি মাতৃভাষা ভাষা শেখার সুযোগ করা হবে। প্রথম ধাপে নির্বাচিত এলাকায় মাতৃভাষাভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাসামগ্রী উন্নয়ন, স্থানীয় সম্প্রদায় থেকে প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। ধাপে ধাপে এই কর্মসূচির পরিসর সম্প্রসারণ করে অধিক সংখ্যক জাতিস্বত্তার শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যাতে ঝরে পড়া কমে এবং শিক্ষার্থীদের শেখার ভিত্তি শক্তিশালী হয়। একই সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রূপান্তর সহজ করতে ব্রিজিং কারিকুলাম চালু করা হবে।

বিশেষ চাহিদা-সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এ লক্ষ্যে সাধারণ ও বিশেষ বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষিত বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক ও সহায়ক কর্মী নিয়োগ, প্রতিবন্ধীবান্ধব অবকাঠামো (র‍্যাম্প, ব্রেইল সাইনেজ, হিয়ারিং-সহায়ক ব্যবস্থা, উপযোগী টয়লেট) উন্নয়ন এবং সহায়ক শিক্ষা উপকরণ

(ব্রেইল বই, অডিও কনটেন্ট, সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, সহায়ক প্রযুক্তি) নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বিশেষ চাহিদা-সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা (Inclusive Education) বাধ্যতামূলক মডিউল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং জেলা পর্যায়ে রিসোর্স সেন্টার গড়ে তুলে বিদ্যালয়গুলোকে কারিগরি ও পেশাগত সহায়তা প্রদান করা হবে, যাতে কোনো শিশু শুধুমাত্র প্রতিবন্ধকতার কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়।

শিক্ষকদের মর্যাদা ও পেশাগত সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পৃথক ও প্রতিযোগিতামূলক বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন করা হবে। বেতন কাঠামো প্রতিবছর মুদ্রাস্ফীতি অনুসারে সমন্বয় করা হবে। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি ও বেতন নির্ধারণে একক, স্বচ্ছ ও মেধাভিত্তিক মানদণ্ড প্রবর্তন করা হবে। প্রতি বছর একটি সমন্বিত পরীক্ষার মাধ্যমে সকল সরকারি শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ সম্প্রসারণ করে শিক্ষকতাকে একটি সম্মানজনক ও আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। পাঁচ বছরের মধ্যে ৭৫% এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে ধাপে ধাপে ও মানদণ্ডভিত্তিক জাতীয়করণের আওতায় আনা হবে। অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রত্যন্ত ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করা হবে এবং বাকিগুলোর জন্য উন্নত এমপিও কাঠামো, পূর্ণ বেতন-ভাতা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দিতে পূর্ববর্তী কর্ম-অভিজ্ঞতা ও অর্জিত দক্ষতার ভিত্তিতে একাডেমিক ক্রেডিট প্রদানের ব্যবস্থা (Recognition of Prior Learning - RPL) চালু করা হবে। এ ব্যবস্থার আওতায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কাজের অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা যাচাই করে শিক্ষার্থীরা কম সময়ে অফিসিয়াল সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবে। এ লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা মান কাঠামো (NSQF) ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে মানসম্মত দক্ষতা মূল্যায়ন, পরীক্ষা ও স্বীকৃতি প্রক্রিয়া প্রণয়ন করা হবে এবং শিল্পখাতের অংশগ্রহণে ট্রেডভিত্তিক মূল্যায়ন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এর ফলে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত লক্ষাধিক দক্ষ শ্রমিকের যোগ্যতা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কলেজসমূহে কর্মসংস্থানমুখী দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রফেশনাল ইংরেজি, প্রফেশনাল এটিকেট ও কমিউনিকেশন, অফিস ম্যানেজমেন্ট, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, বেসিক আইটি, অ্যাডভান্সড আইটি, ডাটা অ্যানালিটিক্স, ডিজিটাল মার্কেটিংসহ বিভিন্ন বিষয়ে ৩-৬ মাস মেয়াদি শর্ট কোর্স চালু করা হবে। কোর্সগুলো হবে ক্রেডিটভিত্তিক ও শিল্প-সংশ্লিষ্ট, যাতে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার অংশ হিসেবে, পাশাপাশি বা স্নাতক শেষে সহজেই অংশগ্রহণ করতে পারে। ফলে দেশে ও বিদেশে কর্মজীবনে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষাগত, পেশাগত ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন যুব বেকারত্ব হ্রাস, রেমিট্যান্স বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক সক্ষমতা জোরদার করতে সহায়ক হবে। বিদ্যমান সরকারি ও বেসরকারি ডিগ্রি কলেজগুলোর শিক্ষার মানোন্নয়নে সমন্বিত নীতি গ্রহণ করা হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের STEM, উৎপাদনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষায় অন্তত ৭০ শতাংশ ভর্তি নিশ্চিত করা হবে।

উচ্চশিক্ষার সাথে কর্মক্ষেত্রের সংযোগ শক্তিশালী করতে স্নাতক পর্যায়ে ৬ মাসের পূর্ণকালীন ইন্টার্নশিপ/থিসিস রিসার্চ বাধ্যতামূলক করা হবে। প্রথমে বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে এই প্রোগ্রাম চালু করা হবে এবং ধাপে ধাপে দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি বাস্তবায়িত হবে। ইন্টার্ন নেয়ার প্রচলন শুরু করা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট ও অফিস, সরকারি অফিস ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের থেকে। পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করতে শুরুর দিকে ইন্টার্নের বেতন খরচের উপর প্রণোদনা প্রদান করা হবে। যুবকর্মসংস্থান দফায় উল্লেখিত মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা প্রজেক্টে অংশ নিলে তার প্রথম ৬ মাস ইন্টার্নশিপ হিসেবে গণ্য করা যাবে। এছাড়া বৈদেশিক আগ্রাসন বিরোধী দফায় উল্লেখিত রিজার্ভ ফোর্সের প্রাইমারি ট্রেনিং এ অংশ নিলে, তা তিন মাস ইন্টার্নশিপ বলে গণ্য করা যাবে।

গবেষণা ও উদ্ভাবনকে রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকারের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে জাতীয় গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) ব্যয় ধাপে ধাপে ৫ বছরে জিডিপির কমপক্ষে ০.৬ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এর মধ্যে সরকার সরাসরি জিডিপির ন্যূনতম ০.৫ শতাংশ (শিক্ষা বাজেটের প্রায় ১৭%) গবেষণায় বিনিয়োগ নিশ্চিত করবে। বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং কৌশলগত খাতে গবেষণার জন্য জাতীয় বাজেটে পৃথক, সুনির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ বরাদ্দ রাখা হবে। একই সঙ্গে শিল্প–বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগিতা জোরদার করে গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে বাস্তব উৎপাদন ও নীতিনির্ধারণে প্রয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হবে, যাতে শিক্ষা ও গবেষণা দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা, উদ্ভাবন ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা শক্তিশালী করে। সারাদেশে একাধিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট গড়ে তোলা হবে যার লক্ষ্য হবে মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রি পর্যায়ের গবেষণা। বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর আউটপুট মূল্যায়নের জন্য কমিশন গঠন করা হবে। এর আওয়তায় অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প বাতিল করা হবে এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সকল আমলাতান্ত্রিক জটিলতামুক্ত করা হবে। একই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রমের নিয়মিত এসেসমেন্ট করবে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মানসম্পন্ন পিএইচডি থাকা ধাপে ধাপে বাধ্যতামূলক করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যেন মানসম্পন্ন গবেষণায় সময় দিতে পারেন সেজন্য টিচিং এসিস্ট্যান্টশিপ এর বহুল প্রচলন করা হবে।

বিশ্বের সেরা ল্যাবগুলোর সাথে সহযোগিতা স্থাপন এবং দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের প্রতিযোগিতামূলক বেতনে নিয়োগ করা হবে। বিশেষত বিদেশের ভালো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাংলাদেশী গবেষকদের দেশের ফেরত আনার জন্য সিনিয়রিটি ও ল্যাবের জন্য এককালীন ফান্ডিং দিয়ে রিভার্স ব্রেন ড্রেইন করা। পাঁচ বছরে ১০০ জন উচ্চমানের দেশী/প্রবাসী/বিদেশী গবেষককে National Research Grant (NRG) এর আওতায় আনা হবে (NSF/ERC/UKRI/ARC Grant এর অনুরূপ)। প্রতিটি প্রজেক্টের (৫-৭ বছর) আওতায় একাধিক পূর্ণকালীন পিএইচডি ও মাস্টার্স শিক্ষার্থী থাকতে হবে। প্রজেক্ট প্রতি এককালীন গড়ে ৫ কোটি টাকা, মাসিক বেতন ২ লাখ টাকা এবং পিএইচডি গবেষকদের মাসিক বেতন ৬০ হাজার টাকা দেয়া হবে। এই প্রোগ্রামের জন্য মোট বাজেট হবে বছরে ১২০ কোটি টাকা।

কম্পিউটেশনাল গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার জন্য একটি ন্যাশনাল কম্পিউটিং সার্ভার তৈরি করা হবে ও বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক কম্পিউটিং ক্লাস্টার আপগ্রেড করা হবে। ন্যাশনাল সুপারকম্পিউটিং ফ্যাসিলিটির জন্য জন্য লক্ষ্যমাত্রা ৩ বছরে ৩০ পেটা ফ্লপ এবং ৫ বছরে ৫০ পেটা ফ্লপ। এর জন্য বাজেট ধরা হয়েছে ৫ বছরে ৩০০ কোটি টাকা।

৭। বিকেন্দ্রীভূত সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা

স্বাস্থ্যখাতে নীতিগত প্রস্তাবনা

- মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, টিকাদান ও সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান লাইনভিত্তিক কর্মসূচিগুলোকে আরও গতিশীল ও ফলাফলমুখী করা হবে, নতুন প্রকল্প না করে বাস্তবায়ন সক্ষমতা জোরদার করা হবে।
- দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মেডিকেল ডিভাইস ও ইকুইপমেন্ট খাতে আত্মনির্ভরতা একটি কৌশলগত অগ্রাধিকার হিসেবে গ্রহণ করা হবে।
    - BUET সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের Biomedical Engineering Department-এর সহায়তায় দেশীয় মেডিকেল ডিভাইস উৎপাদন ও প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হবে।
    - MRI, CT স্ক্যান, ক্যাথল্যাব ইকুইপমেন্ট, ভেন্টিলেটর ও অ্যানেস্থেসিয়া মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য NEMEMW&TC–কে শক্তিশালী করা হবে।
    - পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক জেলায় NEMEMWএর শাখা স্থাপন, সংশ্লিষ্ট জনবল প্রশিক্ষণ ও নিয়োগের মাধ্যমে একটি জাতীয় ইলেক্ট্রো–মেডিক্যাল সার্ভিসিং নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে।
    - মেডিকেল ডিভাইস খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে নীতিগত প্রণোদনা ও ইনসেনটিভ কাঠামো প্রণয়ন করা হবে, যাতে আমদানিনির্ভরতা কমে এবং দেশীয় উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ে।
- প্রতিটি জেলা হাসপাতালে আইসিইউ-সিসিইউ, ডায়ালাইসিস ইউনিট ও ট্রমা কেয়ার চালু করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক-নার্স-টেকনোলজিস্ট নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা কার্যকর সেবা নিশ্চিত করা হবে।
- ওষুধ খাতে Out-of-Pocket Expenditure হ্রাসকে একটি কেন্দ্রীয় নীতিগত লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে। এই লক্ষ্যে জীবনরক্ষাকারী ও নিত্যপ্রয়োজনীয় ওষুধের জন্য জানুয়ারি ২০২৬-এ আপডেটকৃত ২৯৫টি ওষুধের তালিকা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে, এবং মূল্য ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সকল স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এই প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে। ৭২ টি এসেনশিয়াল ওষুধ জন্য ০% স্টক আউট লক্ষ্যমাত্রা
- ৩০+ বয়সীদের জন্য ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, COPD/অ্যাজমা, ক্যান্সার এর স্ক্রিনিং ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্সের আওতায় নিয়ে আসা হবে
- প্রতি বিভাগে ডে-কেয়ার কেমো, পেইন-প্যালিয়াটিভ কেয়ার হাব তৈরি, রেডিওথেরাপি সক্ষমতা দ্বিগুণ করা হবে
- ডেংগু , টাইফয়েড , নিপাহ ভাইরাস প্রভৃতি সংক্রামক রোগ মোকাবেলায় প্রতিকারের আগে প্রতিরোধে মনোযোগ প্রদান করা হবে। IEDCR, DNCC,DSCC, NIPSOM এর সমন্বয়ে "সংক্রামক রোগ Early response and prevention cell" গঠন করা হবে। প্রত্যেক উপজেলার MODC (Medical officer for disease control) এই সেলের অংশ হবেন, যাতে রিয়ালটাইমে তৃণমূল পর্যায়ের রোগ সংক্রমণের বাস্তব তথ্য কেন্দ্রীয় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহনে ভূমিকা রাখতে পারে।

- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি যেমন তাপপ্রবাহ, বন্যা, ঘুর্নিঝড়, রোগ বিস্তার, খাদ্য ও পানির সংকটে জনগণকে ধারাবাহিকভাবে নিরাপদ ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে নগর অঞ্চলে কুলিং-সেন্টার, হিট-অ্যালার্ট, স্বাস্থ্য প্রোটোকল, বন্যাপ্রবণ ও উপকুলীয় এলাকায় মোবাইল ক্লিনিক, Flood resilient health center, নৌ স্বাস্থ্য ইউনিট চালু করা হবে।
- GIS mapping এর মাধ্যমে Epidemic analysis এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার water body management করা হবে
- স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ন্যায্য বেতন, ক্যারিয়ারে অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, নারী স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য কর্মক্ষেত্রে ডে-কেয়ার সেন্টারসহ নারীবান্ধব পদক্ষেপ গ্রহণ করব।
- রোগী ও তাদের পরিবারের জন্য নিরাপদ, মানবিক ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান ও জবাবদিহিতা উন্নত করা হবে।
- ভেজাল ওষুধ নিয়ন্ত্রণে ওষুধ উৎপাদন থেকে বিক্রয় পর্যন্ত কঠোর নজরদারি ও ডিজিটাল ট্র্যাকিং নিশ্চিত করা হবে এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিসহ শক্ত আইনপ্রয়োগ করা। একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রক সংস্থার সক্ষমতা ও স্বাধীনতা বাড়িয়ে নিয়মিত বাজার তদারকি করা হবে।
- প্রতিটি জেলায় কেয়ারগিভিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করে দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থ, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের সেবার জন্য ৫ লক্ষ প্রশিক্ষিত কেয়ারগিভার তৈরি করা হবে। এটি একদিকে স্বাস্থ্যখাতের একটি নতুন কর্মসংস্থান ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে, অন্যদিকে পরিবারভিত্তিক সেবার মান উন্নত করবে।

স্বাস্থ্যপ্রকল্প ১: বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা জোন (Specialized Healthcare Zone (SHZ))

দীর্ঘদিনের কেন্দ্রীভূত, বৈষম্যমূলক এবং অদক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে বাংলাদেশের মানুষ বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য বিদেশমুখী হয়েছে। হৃদরোগ, ক্যান্সার, ট্রমা, বন্ধ্যাত্ব ও জটিল অস্ত্রোপচারের চিকিৎসায় মেডিকেল ট্যুরিজমের কারণে প্রতি বছর প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রা দেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পরিবারবান্ধব কর্মপরিবেশ, মানসম্মত শিক্ষা, নিরাপদ আবাসন ও জীবনমানের অভাব দেশেই একটি কার্যকর বিশেষায়িত স্বাস্থ্য ইকোসিস্টেম গড়ে উঠতে দেয়নি। আমরা এই কাঠামোগত ব্যর্থতা ভাঙতে Specialized Healthcare Zone (SHZ) প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করছি। এটি হবে বিকেন্দ্রীকৃত, রেফারেল-ভিত্তিক, সামাজিকভাবে ন্যায্য এবং অর্থনৈতিকভাবে টেকসই একটি জাতীয় স্বাস্থ্য অবকাঠামো।

- **টাইমলাইন ও অঞ্চল নির্বাচন (Phased Rollout):** প্রথম ৫ বছরের মধ্যে অন্তত একটি SHZ চালু করা হবে এবং পরবর্তীতে আরও দুইটি চালুর উদ্যোগ নেয়া হবে। বিগত ফ্যাসিস্ট শাসনামলে ইপিজেড করার উদ্দেশ্যে অধিগৃহীত কিন্তু বর্তমানে পরিত্যক্ত অঞ্চলগুলোতে SHZ করার পরিকল্পনা করা যেতে পারে, যা জমি অধিগ্রহণের ব্যয় সংকোচন করবে। SHZ গুলোকে ঢাকার বাইরের স্বাস্থ্য হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে, এবং স্বল্প মূল্যের রিসোর্স এবং আবাসনের সুযোগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জনগনকে ঢাকামুখী হওয়া থেকে বিরত

করা। কয়েকটি এলাকা বিবেচনা করা যেতে পারে (নিম্নরূপ), যা পরবর্তী বিস্তারিত এসেস্মেন্টের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে। যেমন:

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল: ঐতিহাসিক স্বাস্থ্যবৈষম্য ও দূরত্বজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায়

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল: জনঘনত্ব, শিল্প ও উপকূলীয় ঝুঁকি বিবেচনায় এবং ঢাকা থেকে সহজ যোগাযোগ বিবেচনায়

- **স্বাস্থ্যসেবা কাঠামো (Core Medical Infrastructure):** প্রতিটি SHZ এ থাকবে, কার্ডিয়াক সেন্টার কম্প্রিহেন্সিভ অনকোলজি বা ক্যান্সার সেন্টার (র‍্যাডিয়েশন অনকোলজি, মেডিকেল অনকোলজি, সারজিক্যাল অনকোলজি), কম্প্রিহেন্সিভ ট্রমা ও ইমারজেন্সি ইউনিট (ভাস্কুলার সার্জারি, অর্থোপেডিক্স, নিউরোসার্জারি ও ডায়ালাইসিস), ফার্টিলিটি ও রিপ্রোডাকটিভ মেডিসিন, জটিল ও রোবোটিক সার্জারিউচ্চমানের ডায়াগনস্টিক হাব, রিহ্যাবিলিটেশন ও প্যালিয়েটিভ কেয়ার এবং শিশুদের জন্য বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা বা বিশেষ হাসপাতাল
- **রেডিয়াস-ভিত্তিক অগ্রাধিকার ব্যবস্থা (Service Radius Policy):** প্রতিটি SHZ একটি নির্দিষ্ট Service Radius কভার করবে। এই রেডিয়াসের ভেতরের জনগণ সরকারি/অনুমোদিত হাসপাতাল থেকে রেফার্ড হলে চিকিৎসায় অগ্রাধিকার পাবে। রেডিয়াসের বাইরের রোগীরা সিরিয়াল ও সক্ষমতা অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে পারবে, কিন্তু চিকিৎসার মান, ডাক্তার ও প্রটোকল সবার জন্য এক থাকবে। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য থাকবে যেন স্থানীয় জনগণ যেন বঞ্চিত না হয় ও ডাক্তার নিয়োগ ও প্র্যাকটিস নীতি প্রতিষ্ঠা করা যায়। SHZ-এ কর্মরত চিকিৎসকরা সার্ভিস রেডিয়াসের ভেতরে অন্য কোনো হাসপাতাল বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্র্যাকটিস করতে পারবেন না। এতে দ্বৈত প্র্যাকটিস, রোগী-বাণিজ্য ও চিকিৎসার অসমতা বন্ধ করা যাবে।
- **সরকারি রেফারেল ও সাবসিডি ব্যবস্থা:** সরকারি হাসপাতাল থেকে রেফার্ড হয়ে SHZ-তে আসা রোগীদের চিকিৎসার একটি অংশ সরকারি সাবসিডি হিসেবে প্রদান করা হবে। এই সাবসিডি সরাসরি হাসপাতালকে দেয়া হবে, রোগীকে নয়। এতে সরকারি হাসপাতালের উপর চাপ কমবে এবং রোগীদের উন্নতমানের সেবা নিশ্চিত হবে। রেফারেল ব্যবস্থায় দুর্নীতি রোধে আর্জেন্ট ও নন-আর্জেন্ট রেফারেলে ভাগ করা যেতে পারে যেখানে কোন রোগ/স্টেজ আর্জেন্ট তার সুনির্দিষ্ট পলিসি থাকবে। নন-আর্জেন্ট রেফারেলে কঠোরভাবে এলাকাভিত্তিক ক্রম অনুসরণ করতে হবে। আর্জেন্ট রেফারেল সুযোগ অনুযায়ী অগ্রাধিকার পাবে। সেই সাথে, রেফারেল ব্যবস্থা নিয়ে দুর্নীতির হার কমাতে প্রকল্প পরিচালক বরাবর সরাসরি অভিযোগ করার সুযোগ থাকবে।
- **চিকিৎসক, কর্মী ও রোগীদের জন্য ইকোসিস্টেম**

  প্রতিটি SHZ–এ উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের মডেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হবে যেখানে স্বাস্থ্যকর্মীদের সন্তানদের অগ্রাধিকার থাকবে। এছাড়া বিনোদন ও জীবনমানের জন্য সবুজ পার্ক, হাঁটার পথ, জিমনেসিয়াম ও কমিউনিটি সেন্টার, সিনেমা হল, লাইব্রেরি ও সাংস্কৃতিক স্পেস গড়ে তোলা হবে। Medical Hospitality কে মাথায় রেখে রোগী ও স্বজনদের আবাসনের জন্য এখানে হাসপাতাল-সংলগ্ন Patient Villageএ স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদি আবাসন, কেয়ারগিভার সাপোর্ট ও হুইলচেয়ার-অ্যাক্সেসিবল অবকাঠামো রাখা হবে। দীর্ঘমেয়াদে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রোগীদের জন্য medical tourism এর জন্য উপযোগী পরিবেশ হিসাবে তৈরি করবে। হাসপাতালের আশেপাশে প্রবাসী ও অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী আবাসন ও সেই সাথে ওল্ড কেয়ার

ভিলেজ রাখা হবে। এই আবাসন পরিকল্পনায় প্রবাসীরা যারা বার্ধক্যে দেশে ফিরতে চান তারা লটারির মাধ্যমে প্লট/ফ্ল্যাট বুকিং করতে পারবেন এবং তাদের বিনিয়োগে প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে।

- **বিনিয়োগ কাঠামো (Multi-Channel Financing)**: SHZ–এ বিনিয়োগ পরিকল্পনার জন্য PPP (Public–Private Partnership), দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী, প্রবাসী বন্ড (Diaspora Bond), উন্নয়ন সহযোগী ও সরকারের নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করা হবে।
- **সমন্বয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সুযোগ:** সাম্প্রতিকভাবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে চীনের বৃহৎ বিনিয়োগ উদ্যোগ, বিশেষ করে 'চায়না-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ জেনারেল হাসপাতাল' এবং উত্তরবঙ্গে টারসিয়ারি বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাব এই নীতিমালার সাথে কৌশলগতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এসব উদ্যোগকে বিচ্ছিন্ন প্রকল্প হিসেবে না দেখে, প্রস্তাবিত Specialized Healthcare Zone (SHZ) কাঠামোর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে আঞ্চলিক চিকিৎসা হাব, প্রযুক্তি হস্তান্তর, বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ এবং রেফারেল-ভিত্তিক সেবার একটি টেকসই ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা সম্ভব। আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনার সাথে যুক্ত করাই হবে এনসিপির অগ্রাধিকার, যাতে বিদেশি সহায়তা দেশের দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে রূপান্তরিত হয়।
- **প্রতি SHZ এর বাজেট (Indicative)**
  অবকাঠামো: ২ হাজার কোটি টাকা
  শিক্ষা, আবাসন, বিনোদন খাতে: ৫০০ কোটি টাকা
  বার্ষিক পরিচালন ব্যয়: ৫০০ কোটি টাকা
  বিদেশগামী চিকিৎসা ব্যয়ের মাত্র ২০% দেশেই ধরে রাখতে পারলে SHZ গুলো নিজেই টেকসই হয়ে উঠবে।
- **SHZ পরিচালন টেকসইকরণ ও ব্যবহার হার নীতি**: SHZ-এর দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য নির্ভর করবে অপারেশনাল পর্যায়ে পর্যাপ্ত সক্ষমতা ব্যবহার (capacity utilization) ও ধারাবাহিক রাজস্ব প্রবাহ নিশ্চিত করার উপর। SHZ-এ বিদ্যমান শয্যা, অপারেশন থিয়েটার ও বিশেষায়িত সেবার সক্ষমতা যদি নিয়মিতভাবে ব্যবহার না হয়, তাহলে দীর্ঘমেয়াদে এই জোনগুলো অর্থনৈতিকভাবে টেকসই থাকবে না। এই ঝুঁকি মোকাবিলায় SHZ-ভিত্তিক বিশেষায়িত স্বাস্থ্যবীমা, যা কেবল টারশিয়ারি স্তরের চিকিৎসার জন্য প্রযোজ্য হবে এবং রোগীদের SHZ–এ চিকিৎসা নিতে উৎসাহিত করবে। তাছাড়া সরকার নির্ধারিত মূল্যহারের মাধ্যমে সার্জারি, কেমোথেরাপি ও শয্যা ভাড়ার ব্যয় পূর্বানুমেয় ও স্থিতিশীল রাখা হবে। অছচ্ছল রোগীদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক সরকারি ভর্তুকির ব্যবস্থা করা হবে। খরচের পুরো কাঠমোকে পরবর্তীতে ন্যাশনাল হেলথ ইনস্যুরেন্সের সাথে যুক্ত করা হবে। তাছাড়া আন্তঃSHZ রেফারেল ও লোড-ব্যালান্সিং ব্যবস্থা রাখা হবে যাতে এক অঞ্চলে চাপ বাড়লে অন্য অঞ্চলে রোগী স্থানান্তরের মাধ্যমে সামগ্রিক সক্ষমতা ভারসাম্য বজায় থাকে।

স্বাস্থ্যপ্রকল্প ২: জাতীয় অ্যাম্বুলেন্স ও প্রি–হসপিটাল ইমার্জেন্সি সিস্টেম (National Ambulance & Pre-Hospital Emergency Care System)

বাংলাদেশে জরুরি স্বাস্থ্যসেবার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হাসপাতালের বাইরে, অর্থাৎ হাসপাতালে পৌঁছানোর আগের সময়টিতে। সরকারি অ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা কম, আর প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্স থাকলেও সেগুলোর মধ্যে সমন্বিত ডিসপ্যাচ, মাননিয়ন্ত্রণ ও জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা প্রদানের বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে দুর্ঘটনা, হৃদরোগ, স্ট্রোক ও প্রসূতি জটিলতায় বহু মানুষ হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই জীবন হারান। এই সংকট সমাধানে আমরা একটি জাতীয়, জিপিএস-চালিত, সমন্বিত অ্যাম্বুলেন্স ও প্রি-হসপিটাল ইমার্জেন্সি সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করব। এজন্য সেন্ট্রালাইজড জরুরি ফোন নাম্বার চালু করা হবে যেমন ৩১১

- **ভিশন ও পরিসর (Vision & Coverage)**

এই সিস্টেমের লক্ষ্য হবে জরুরি কলে দ্রুততম রেসপন্স নিশ্চিত করা এবং হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা শুরু করা। সরকারি ও প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্সকে একই জাতীয় নেটওয়ার্কে এনে শহর ও গ্রাম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সমান মানের জরুরি সেবা নিশ্চিত করা হবে।

- **সিস্টেম কাঠামো (System Architecture)**

সারা দেশের সকল সরকারি অ্যাম্বুলেন্সকে একটি কেন্দ্রীয় ডিসপ্যাচ ও কন্ট্রোল সিস্টেমের আওতায় আনা হবে। প্রতিটি অ্যাম্বুলেন্সে জিপিএস সংযুক্ত থাকবে, যাতে জরুরি কলের অবস্থান শনাক্ত করে নিকটতম অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো যায় এবং সংশ্লিষ্ট হাসপাতালকে আগাম জানানো যায়।

- **মাইলেজ-ভিত্তিক অপারেশন**

সরকারি অ্যাম্বুলেন্স সেবার কার্যকারিতা গাড়ির সংখ্যা দিয়ে নয়, বরং কত কিলোমিটার জরুরি সেবা দেওয়া হয়েছে এবং কী ধরনের ট্রিপে দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে। এতে কম সংখ্যক গাড়ি দিয়েই বেশি এলাকা কভার করা সম্ভব হবে এবং অলস বা অপব্যবহৃত অ্যাম্বুলেন্স শনাক্ত করা যাবে এবং ম্যানুয়াল মাইলেজ লগিং ব্যবহার করে যে জ্বালানি আত্মসাৎ হয় তা প্রতিরোধ সম্ভব হবে।

- **দক্ষ প্যারামেডিক ও প্রি–হসপিটাল কেয়ার**

প্রতিটি জরুরি অ্যাম্বুলেন্সে প্রশিক্ষিত প্যারামেডিক থাকা বাধ্যতামূলক করা হবে। প্যারামেডিকরা হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই অক্সিজেন, CPR, রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রাথমিক লাইফ সাপোর্ট নিশ্চিত করবেন। প্যারামেডিক ছাড়া চলা অ্যাম্বুলেন্সকে জরুরি সেবা হিসেবে গণ্য করা হবে না।

- **সরকারি ও প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্সের সমন্বয় ও খরচ কাঠামো**

সব প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্সকে একই জাতীয় ডিসপ্যাচ ও জিপিএস নেটওয়ার্কে যুক্ত করা হবে। তবে সরকারি ও প্রাইভেট সেবার খরচ কাঠামো আলাদা থাকবে এবং তা স্ট্যান্ডার্ড–ভিত্তিক হবে। প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্স রোগী বা ইনসুরেন্স থেকে নির্ধারিত রেটে চার্জ নেবে, আর সরকারি ডিসপ্যাচ বা রেফারালে ব্যবহৃত হলে সরকার নির্ধারিত মাইলেজ রেটে পেমেন্ট পাবে।

- **কেপিআই (Key Performance Indicators)**

এই সিস্টেমের সাফল্য মূল্যায়ন করা হবে জরুরি কলে গড় রেসপন্স টাইম, প্রতি জেলা ও উপজেলায় সরকারি অ্যাম্বুলেন্সের কভার করা মোট জরুরি মাইলেজ, মোট ট্রিপের কত শতাংশে প্যারামেডিক দ্বারা প্রি–হসপিটাল কেয়ার দেওয়া হয়েছে, সরকারি বনাম প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্স কভারেজ অনুপাত ইত্যাদির উপর

- **টাইমলাইন (Phased Implementation)**

প্রথম ধাপ (০-১২ মাস): কেন্দ্রীয় ডিসপ্যাচ ও জিপিএস প্ল্যাটফর্ম চালু, সব সরকারি অ্যাম্বুলেন্স যুক্তকরণ, প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্সের স্ট্যান্ডার্ড ও লাইসেন্সিং, প্যারামেডিক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ শুরু।

দ্বিতীয় ধাপ (১২-৩৬ মাস): সব জেলা ও উপজেলায় মাইলেজ–ভিত্তিক KPI বাস্তবায়ন, প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্স ধাপে ধাপে নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত, রেসপন্স টাইম ও প্রি–হসপিটাল কেয়ারের মান উন্নয়ন।

তৃতীয় ধাপ (৩-৫ বছর): সারা দেশে পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত অ্যাম্বুলেন্স নেটওয়ার্ক, বিশেষায়িত হৃদরোগ ও ট্রমা সেন্টারের সাথে পূর্ণ সংযোগ, জরুরি চিকিৎসাজনিত মৃত্যু উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস।

- **বাজেট (Indicative)**

কেন্দ্রীয় ডিসপ্যাচ, জিপিএস ও আইটি অবকাঠামো: ৮০০-১,২০০ কোটি টাকা (এককালীন)।

প্যারামেডিক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ: ৬০০-৮০০ কোটি টাকা।

বার্ষিক পরিচালন ব্যয় ও মাইলেজ-ভিত্তিক পেমেন্ট: ১,২০০-১,৫০০ কোটি টাকা প্রতি বছর।

স্বাস্থ্যপ্রকল্প ৩: স্বাস্থ্য অবকাঠামো, ডিজিটাল ব্যবস্থা ও জবাবদিহি কাঠামো

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার একটি মৌলিক দুর্বলতা হলো রোগীর চিকিৎসা ইতিহাসের (Health Record) বিচ্ছিন্নতা, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি এবং এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে গেলে চিকিৎসা ধারাবাহিকতা ভেঙে যাওয়া।একই সঙ্গে চিকিৎসার মান, মূল্য নির্ধারণ এবং রোগীর অভিযোগ নিষ্পত্তিতে কার্যকর জবাবদিহির ঘাটতি স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা দুর্বল করেছে। এই কাঠামোগত সমস্যাগুলো সমাধানে একটি সমন্বিত ডিজিটাল ও গভর্ন্যান্স–ভিত্তিক স্বাস্থ্য অবকাঠামো গড়ে তোলা জরুরি।

এই লক্ষ্যে এনআইডি–লিঙ্কড (শিশুদের ক্ষেত্রে জন্মসনদ–লিঙ্কড) ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড (EHR) সিস্টেম চালু করা হবে। এতে প্রতিটি নাগরিকের চিকিৎসা-সংক্রান্ত তথ্য নিরাপদভাবে ডিজিটালি সংরক্ষিত থাকবে। ফলে অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা কমবে, ভুল চিকিৎসার ঝুঁকি হ্রাস পাবে এবং একটি কার্যকর রেফারেল ব্যবস্থার মাধ্যমে রোগী এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা অব্যাহত রাখতে পারবেন। এই রূপান্তর টেকসই করতে MBBS ও BDS কারিকুলামে WHO স্ট্যান্ডার্ড ICD কোডিং অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যাতে ভবিষ্যৎ চিকিৎসক ও ডেন্টাল সার্জনরা আন্তর্জাতিক মানের EHR–trained জনশক্তি হিসেবে গড়ে ওঠেন।

একই সঙ্গে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার বিদ্যমান শক্তিশালী কাঠামোকে একটি স্পষ্ট রেফারেল ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে এবং জেলা সদর হাসপাতালগুলোকে রেফারেল সেবার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে গড়ে তোলা হবে। Non-Communicable Disease (NCD)এর ক্রমবর্ধমান চাপ মোকাবিলায় পর্যায়ক্রমে প্রতিটি জেলা সদর হাসপাতালে ক্যাথল্যাব স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হবে।

এই ডিজিটাল ও ক্লিনিক্যাল অবকাঠামোর পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার আনা হবে। এ লক্ষ্যে একটি স্বাস্থ্য ন্যায়পাল কাউন্সিল (Health Ombudsman Council) গঠন করা হবে, যেখানে থাকবেন একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, একজন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র অধ্যাপক চিকিৎসক এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব। ওষুধ ও চিকিৎসার মূল্য নির্ধারণ, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য এবং জনস্বার্থ সম্পৃক্ত জটিল ইস্যুতে এই কাউন্সিলের মতামত নীতিনির্ধারণে লেভারেজ হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

পাশাপাশি BMDC–এর অধীনে একটি অনলাইন Grievance Monitoring & Resolution System (GMRS) চালু করা হবে। BMDC ওয়েবসাইটে প্রত্যেক চিকিৎসকের নাম, ছবি ও লাইসেন্স নম্বরসহ একটি সার্চযোগ্য ডাটাবেজ থাকবে এবং রোগীরা অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন। প্রতিটি অভিযোগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা বাধ্যতামূলক থাকবে। চিকিৎসা নথির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে মেডিকো-লিগ্যাল সার্টিফিকেট, ডিসচার্জ সার্টিফিকেটসহ সকল সরকারি চিকিৎসা নথিতে স্বাক্ষরকারী চিকিৎসকের লাইসেন্স নম্বর স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা হবে। ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে QR কোড সম্বলিত ডিজিটাল সার্টিফিকেট চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

স্বাস্থ্যপ্রকল্প ৪: উপজেলা পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা

বাংলাদেশে প্রায় প্রতি পাঁচ জনে একজন কোনো না কোনো মানসিক ব্যাধিতে ভোগেন, অথচ তাদের প্রায় নব্বই শতাংশই কোনো ধরনের চিকিৎসা বা সহায়তা পান না। দীর্ঘদিনের নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থা, সামাজিক অনিশ্চয়তা এবং সম্মানজনক কর্মসংস্থানের অভাব মানসিক সংকটকে আজ ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিয়েছে। তবুও মানসিক স্বাস্থ্য খাতে সরকারের বরাদ্দ মোট স্বাস্থ্য বাজেটের ০.৫ শতাংশেরও কম, যার অধিকাংশই ঢাকার কয়েকটি মানসিক হাসপাতালে ব্যয় হয়। উপজেলা, জেলা এবং স্কুল/কলেজ পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যত অনুপস্থিত। আমরা প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অন্তত একজন করে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা প্রশিক্ষিত কাউন্সেলর দেব। সরকার যদি নবম গ্রেডে একটি স্থায়ী পদ সৃষ্টি করে, তবে বছরে গড়ে একজনের পেছনে ব্যয় হবে আনুমানিক ৬.৩ লাখ টাকা। দেশের সব উপজেলা মিলিয়ে বার্ষিক মোট ব্যয় দাঁড়াবে প্রায় ৩০০ থেকে ৩২০ কোটি টাকা, যা সাম্প্রতিক জাতীয় স্বাস্থ্য বাজেটের তুলনায় একটি নগণ্য অংশ মাত্র। অর্থাৎ নতুন কোনো কর আরোপ না করেও, বর্তমান স্বাস্থ্য বাজেটের সামান্য পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমেই উপজেলা পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা চালু করা সম্ভব।

স্বাস্থ্য প্রকল্প ৫: ন্যাশনাল হেলথ ইনস্যুরেন্স

বাংলাদেশে বিদ্যমান বিপুল প্রাইভেট হাসপাতাল ও হেলথ ইন্ডাস্ট্রি বিবেচনায় এবং বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত খুব কম বলে স্বাস্থ্যসেবার সমগ্র খরচ সরকারি করা (ব্রিটেনের মত) অর্থনৈতিক ভাবে খুবই কঠিন। অন্যদিকে ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ হেলথ ইনস্যুরেন্সের অধীনে হাইব্রিড মডেলে কাজ করে। বাংলাদেশের বাস্তবতা বিবেচনায় আমরা ১০ বছরে এরকম ন্যাশনাল হেলথ ইনস্যুরেন্সের অধীনে শতভাগ কাভারেজ নিশ্চিত করতে চাই। যদি বাংলাদেশের অর্থনীতি চাঙ্গা থাকে এবং কার্যকর করব্যবস্থার অধীনে উচ্চ কর-জিডিপি অর্জন সম্ভব হয়, তবে ৬-৭ বছরেও সম্ভব হতে পারে।

এ ব্যবস্থায় প্রাইমারি ও জরুরি স্বাস্থ্যসেবা সরকারিভাবেই করা হবে এবং রোগীর থেকে নামমাত্র মূল্যে। ওষুধ ও উন্নত/ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার খরচের জন্য বাধ্যতামূলক সরকারি ইনস্যুরেন্সের আওতায় আসতে হবে। এই সরকারি ইনস্যুরেন্সটির মাসিক প্রিমিয়াম নির্ভর করবে আয়ের উপর। ফলে যারা নিম্ন আয়ের (যেমন আয়কর সীমার নিচে), তাদের জন্য এই প্রিমিয়াম ফ্রি বা প্রায় ফ্রি হবে। যাদের আয় যত বেশি, এই ইনস্যুরেন্স সিস্টেমে তাদের প্রিমিয়ামও তত বেশি হবে। ফলে ইনস্যুরেন্সর অধীনে থাকলে উন্নত চিকিৎসায়ও নামেমাত্র ব্যয় হবে। তবে, এগুলো কেবল প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে; কসমেটিক বা অপশনাল চিকিৎসায় ইনস্যুরেন্স থাকবে না। কেউ চাইলে নামমাত্র ব্যয়টুকু অথবা অপশনাল চিকিৎসার জন্য প্রাইভেট ইনস্যুরেন্স নিতে পারে। ইনস্যুরেন্সের অধীনে থাকা কেউ যদি সরকারি হাসপাতালে না যেয়ে বেসরকারি হাসপাতালে যেতে চান, তবে এই চিকিৎসা সরকারি হাসপাতালে যত খরচ হতো তার একটি অংশ তিনি বেসরকারি হাসপাতালের বিল দিতে ব্যয় করতে পারবেন।

আয়ের সাথে ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে সংযুক্ত করতে হলে অর্থনীতি সংস্কার দফায় উল্লেখিত পদ্ধতিতে সকল নাগরিকের আয় নিরূপণ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। একই সঙ্গে এই ব্যবস্থাকে কার্যকর ও টেকসই করতে ইলেক্ট্রনিক হেলথ রেকর্ড (EHR) চালু করা এবং দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সাথে এর পূর্ণ সিনক্রোনাইজেশন নিশ্চিত করা জরুরি। যার ফলে ইনস্যুরেন্স ক্লেইম যাচাই, জালিয়াতি রোধ এবং সেবার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে প্রথম দুই-তিন বছরের মধ্যে দেশের সকল নাগরিকের আয় নিরূপণ সম্পন্ন করা, এবং সকল নাগরিকের জন্য একটি কার্যকর ও নিরাপদ ই-হেলথ রেকর্ড ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এই রূপান্তর প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করতে ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কাভারেজকে একটি শক্তিশালী ইনসেন্টিভ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। যারা আয় ঘোষণা ও ই-হেলথ রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত হবে, তারা অগ্রাধিকারভিত্তিতে ইনস্যুরেন্স সুবিধা ও প্রিমিয়ামে ছাড় পাবে।

বাস্তবায়নের প্রথম ধাপে, জনস্বাস্থ্যের ওপর সবচেয়ে বেশি আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে এমন জটিল অস্ত্রোপচার, জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা, ডায়াগনোস্টিক্স ও প্রয়োজনীয় ওষুধ ইনস্যুরেন্স কাভারেজের আওতায় আনা হবে। এতে চিকিৎসা ব্যয়ের কারণে দারিদ্র্যে পতনের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে। এই লক্ষ্যে রাজস্ব সক্ষমতার সঙ্গে সমন্বয় রেখে ধাপে ধাপে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে জিডিপির কমপক্ষে ২ শতাংশে উন্নীত করা হবে। পরবর্তী ধাপে, সিস্টেমের সক্ষমতা ও রাজস্ব ভিত্তি শক্তিশালী হওয়ার সাথে সাথে ধাপে ধাপে আউটডোর চিকিৎসা, দীর্ঘমেয়াদি রোগ ব্যবস্থাপনা, এবং প্রতিরোধমূলক সেবা ইনস্যুরেন্স কাভারেজে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এভাবে একটি ধাপে ধাপে বিস্তৃত, ন্যায্য ও টেকসই ন্যাশনাল হেলথ ইনস্যুরেন্স ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

৮ । নারীর নিরাপত্তা, অধিকার ও ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন দীর্ঘদিন ধরে স্লোগান ও প্রতীকে সীমাবদ্ধ থেকেছে। বাস্তবে নারীরা রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চলাচল ও কর্মসংস্থানের প্রতিটি ধাপে কাঠামোগত বাধার মুখে পড়েন। এর জন্য ব্যক্তি উদ্যোগ না, রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমেই সমাধান করা সম্ভব। আইনি সুরক্ষা থাকলেও প্রয়োগের ঘাটতি, সুযোগ থাকলেও প্রাপ্যতার বৈষম্য, এবং নীতির ঘোষণা থাকলেও বাস্তব অবকাঠামোর অভাব নারীদের এগিয়ে যাওয়াকে সীমিত করে রেখেছে। আমরা বিশ্বাস করি, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপদ যাতায়াত ও শিশুযত্নসহ সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। নিচে প্রস্তাবিত নীতিমালা ও প্রকল্পসমূহ সেই লক্ষ্যেই প্রণীত যেখানে নারীকে কেবল উপকারভোগী নয়, বরং সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ও সমাজ নির্মাণের অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

নীতিমালাসমূহ

- নারীর ক্ষমতায়ন বাড়াতে নিম্নকক্ষে ১০০টি সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করবো যার সংখ্যা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সাথে সাথে হ্রাস করা হবে।
- উত্তরাধিকার সম্পত্তির বণ্টনে পিতা-মাতার ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সুরক্ষা এবং সন্তানের সেই অনুসারে প্রাপ্য অধিকার দ্রুত বুঝে পেতে আইনি সহায়তার পরিসর বৃদ্ধি করা হবে।
- পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, অনলাইন ও যানবাহনে নারীদের হয়রানি ও নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি, কঠোর শাস্তির বিধান এবং ভিকটিমদের ব্যক্তি পরিচয় গোপন রাখতে গণমাধ্যম নীতিমালা জারি করা হবে।
- অনলাইন হ্যারাসমেন্ট প্রতিরোধে পুলিশ সাইবার সাপোর্ট সেন্টার ফর উইমেনের (পিসিএসডব্লিউ) সক্ষমতা ও প্রচারণা বৃদ্ধি, অভিযোগ করার পদ্ধতি সহজ করা হবে।
- প্রতিটি থানায় নারী সহিংসতা প্রতিরোধ সেল ও নারী পুলিশ নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হবে।
- সকল প্রতিষ্ঠানে পূর্ণবেতনে ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ১ মাসের পিতৃত্বকালীন ছুটি বাধ্যতামূলক করা হবে। প্রসবকালীন জটিলতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে অতিরিক্ত ছুটির ব্যবস্থা থাকবে।
- কাবিননামায় উল্লেখ্য অর্থ আদায়ের জন্য অর্থঋণ আদালতে যাবার বিধান করা হবে। ফলে দেনমোহর ও খোরপোষ আদায়ের উদ্দেশ্যে পারিবারিক নির্যাতনের মামলা করার প্রচলন বন্ধ হবে।
- সরকারি কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য প্রতি মাসে একদিন অর্ধবেতনে ঐচ্ছিক "পিরিয়ড লিভ" চালু করা হবে। পরবর্তীতে দেশব্যপী সকল কর্মক্ষেত্রে পিরিয়ড লিভের বিধান বাধ্যতামূলক করা হবে। সেক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের পিরিয়ড লিভের দিনের অর্ধবেতনে সরকারি ভর্তুকির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ডে-কেয়ার সুবিধা বাধ্যতামূলক করা হবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ডে-কেয়ার সুবিধায় প্রণোদনা দেয়া হবে।
- উপজেলা পর্যায়ে কম খরচে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে এই সেবা নারীর জন্য সহজলভ্য করা এবং প্রচারণা চালানো।
- বাল্যবিবাহ রোধে ব্যাপক জনসচেতনতা ক্যাম্পেইন এবং স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া হবে।

পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের নারীদের উচ্চশিক্ষা বৃত্তি: রংপুর বিভাগ পাইলট প্রকল্প

বাংলাদেশে প্রধান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাওয়া বহু নারী শিক্ষার্থী আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে সেই সুযোগ ধরে রাখতে পারেন না। বিশেষ করে অনুন্নত ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চল থেকে আসা নারীরা এই কাঠামোগত বাধার মুখে পড়েন। এই বৈষম্য দূর করতে প্রথম ধাপে রংপুর বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনা করা এবং প্রধান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাওয়া নারীদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক উচ্চশিক্ষা বৃত্তি চালু করা হবে। এটি একটি পাইলট কর্মসূচি হিসেবে বাস্তবায়িত হবে, যার ফলাফলের ভিত্তিতে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে সম্প্রসারণ করা হবে।

যোগ্যতা ও নির্বাচন: রংপুর বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট বছরে প্রধান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাওয়া, স্বল্প আয়ের পরিবার থেকে আগত নারী শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য বিবেচিত হবেন। নির্বাচন হবে উচ্চমাধ্যমিক ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাক্রম ও অঞ্চলভিত্তিক অগ্রাধিকার অনুসারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার পরপরই শিক্ষার্থীরা আবেদন করার সুযোগ পাবেন।

বৃত্তির পরিমাণ ও কভারেজ: প্রতি শিক্ষার্থীকে মাসিক ৫,০০০ টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হবে। স্নাতক পর্যায়ে প্রতি বছর রিভিউর মাধ্যমে ৪ বছর পর্যন্ত এই সহায়তা চলবে। প্রতি বছর প্রায় ২,০০০ নারী শিক্ষার্থী এই বৃত্তির আওতায় আসবেন।

বাজেট কাঠামো (Indicative): প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য বার্ষিক ব্যয় হবে ৬০,০০০ টাকা। ফলে মোট বার্ষিক বাজেট দাঁড়াবে আনুমানিক ৫০ কোটি টাকা।

সামাজিক দায়বদ্ধতা: এই বৃত্তির সঙ্গে একটি ন্যায্য সামাজিক দায়বদ্ধতা যুক্ত থাকবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা স্নাতক সম্পন্ন করার পর নিজ নিজ এলাকায় কমপক্ষে দুই বছর স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষাপ্রদানে যুক্ত থাকবেন। এই সময়ে সম্মানজনক ভাতা ও ন্যূনতম কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হবে এবং দায়িত্ব সফলভাবে সম্পন্নকারীদের জন্য ভবিষ্যতে সরকারি চাকরি বা উচ্চশিক্ষায় অগ্রাধিকার বিবেচনা করা হবে।

টাইমলাইন ও পরবর্তী ধাপ: এই পাইলট কর্মসূচি ১ বছরের মধ্যে চালু করা হবে। ফলাফল মূল্যায়নের ভিত্তিতে পাহাড়ি অঞ্চল ও মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আগত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করে কর্মসূচি ধাপে ধাপে সম্প্রসারণ করা হবে।

প্রান্তিক অঞ্চলে স্যানিটারি স্বাস্থ্যসামগ্রী সরাসরি বরাদ্দ

স্যানিটারি সামগ্রীর বাজারে প্রাপ্যতা থাকলেও গ্রাম ও প্রান্তিক এলাকায় নিয়মিত ও সুলভ সরবরাহ নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ জরুরি। তাই উপজেলা-ভিত্তিক বিকেন্দ্রীকৃত কাঠামোতে স্যানিটারি সামগ্রীসহ প্রয়োজনীয় নারীবান্ধব স্বাস্থ্যসামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। এই কর্মসূচির আওতায় উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সরকারি স্কুল ও কলেজে সরাসরি বরাদ্দ দেওয়া হবে। অপচয় ও পুনর্বিক্রয় ঠেকাতে প্রতি উপকারভোগীকে মাসে সর্বোচ্চ ১০ পিস স্যানিটারি সামগ্রী দেওয়া হবে। বিতরণ হবে নামভিত্তিক/তালিকাভিত্তিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী তালিকা এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবা-রেজিস্টারের সাথে যুক্ত করে, যাতে বাইরে বিক্রি বা জমা করার সুযোগ না থাকে।

বাজেট কাঠামো (Indicative): ৬০০–১৫০০ কোটি টাকা/বছর

উপকারভোগী: অগ্রাধিকারভিত্তিতে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সেবাগ্রহীতা (প্রায় ১–১.৫ কোটি)

টাইমলাইন: ১২–১৮ মাসে ধাপে ধাপে রোলআউট

নারীর নিরাপদ যাতায়াত: কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত ও এলাকাভিত্তিক শাটল সার্ভিস

১। **কাজে যাই (নারী কর্মযাত্রা বাস সার্ভিস)**

বাংলাদেশে নারীর কর্মসংস্থানের পথে অন্যতম বড় বাধা হলো কর্মস্থলে যাতায়াতের অনিরাপত্তা। গণপরিবহনে হয়রানি, অনিয়মিত সার্ভিস এবং সন্ধ্যা ও রাতের সময় নিরাপত্তাহীনতা নারীদের চাকরি গ্রহণ ও ধরে রাখাকে কঠিন করে তোলে। তাই নিরাপদ যাতায়াত কোনো অতিরিক্ত সুবিধা নয়; এটি নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার একটি মৌলিক অবকাঠামো।

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরকে কেন্দ্র করে কাজে যাই বাস সার্ভিস–এর একটি পাইলট চালু করা হবে। প্রথম বছরে ঢাকায় ৫০টি এবং চট্টগ্রামে ২৫টি বিশেষ বাস নির্দিষ্ট রুটে চালু করা হবে, যেখানে কর্মজীবী নারী ও শ্রমঘন এলাকার যাতায়াত চাহিদা সবচেয়ে বেশি।

নির্দিষ্ট মানদণ্ড ও চুক্তিভিত্তিক কাঠামোর অধীনে সরকারি পরিবহন সংস্থা ও বেসরকারি অপারেটরদের যুক্ত করা হবে। সার্ভিসে থাকবে নির্ধারিত সময়সূচি, জিপিএস ট্র্যাকিং, সিসিটিভি, প্রশিক্ষিত চালক ও কন্ডাক্টর এবং জরুরি সহায়তা ব্যবস্থা। ভাড়া কাঠামো, নিরাপত্তা মান ও জবাবদিহি থাকবে সরকারের তত্ত্বাবধানে।

বাজেট (Indicative): ২৫০–৫০০ কোটি টাকা/বছর

টাইমলাইন: ১২–১৮ মাস

২) **এদিক-ওদিক (এলাকা শাটল সার্ভিস)**

নারী ও কন্যাশিশুর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় শাটল সার্ভিস চালু করা হবে। এই সার্ভিস হবে এলাকা-ভিত্তিক ও অন-ডিমান্ড, যেখানে প্রশিক্ষিত ড্রাইভার ও সহকারী দ্বারা ঝুঁকিপূর্ণ সময়ে যাত্রীকে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হবে।

পাইলট পর্যায়ে মিরপুর, মোহাম্মদপুর, বাড্ডা, বারিধারা, উত্তরা এবং অনুরূপ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই সার্ভিসও চুক্তিভিত্তিক কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হবে এবং জিপিএস ট্র্যাকিং, জরুরি সহায়তা ব্যবস্থা ও পারফরম্যান্স-ভিত্তিক পেমেন্টের মাধ্যমে মান নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

টাইমলাইন: ১২-১৮ মাস

বাজেট কাঠামো (Indicative):

- এককালীন ব্যয় (প্রথম বছর): আনুমানিক ৬০–৮০ কোটি টাকা
- নিয়মিত ব্যয় (বার্ষিক): আনুমানিক ১২০–১৮০ কোটি টাকা/বছর

নগর শিশুবিকাশকেন্দ্র (ডে-কেয়ার সেন্টার)

বাংলাদেশে নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ সীমিত থাকার অন্যতম প্রধান কারণ হলো সাশ্রয়ী ও নিরাপদ চাইল্ড কেয়ারের অভাব। বর্তমানে ঢাকায় চালু থাকা ২৫টি সরকারি ডে-কেয়ার কেন্দ্র আধুনিকীকরণ করা হবে এবং ঢাকা, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ ও চট্টগ্রামে কর্মজীবী নারী ও শ্রমঘন এলাকায় আরও ৩০০ টি নতুন ডে-কেয়ার কেন্দ্র ধাপে ধাপে স্থাপন করা হবে। নির্দিষ্ট মানদণ্ড ও চুক্তিভিত্তিক কাঠামোর অধীনে সরকারি বা সরকার-নির্ধারিত স্থাপনা বেসরকারি ও কমিউনিটি সংস্থাকে লিজ দিয়ে পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হবে। ভর্তুকি, এককালীন প্রণোদনা এবং মান-ভিত্তিক অর্থপ্রদানের মাধ্যমে অপারেটরদের যুক্ত করা হবে, তবে সেবার মান, ফি কাঠামো ও জবাবদিহি থাকবে সরকারের তত্ত্বাবধানে।

বাজেট কাঠামো (Indicative):

এককালীন ব্যয় (২-৩ বছরে): ডে-কেয়ার স্থাপনে প্রাথমিক গ্রান্ট, নিরাপত্তা, সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণে ১০০–১৫০ কোটি টাকা

নিয়মিত ব্যয় (বার্ষিক): স্বল্পআয়ের পরিবারের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার ভর্তুকি ও মান-ভিত্তিক অর্থপ্রদান লক্ষ্যে ১২০-২০০ কোটি টাকা/বছর।

৯। প্রবাসীর মর্যাদা ও অধিকার

বাংলাদেশের উন্নয়ন, অর্থনীতি ও কূটনীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদান অনস্বীকার্য। প্রায় এক থেকে দেড় কোটি প্রবাসী নাগরিক তাঁদের রেমিট্যান্স, দক্ষতা, জ্ঞান ও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। তবুও দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও নাগরিক অধিকারের পূর্ণ স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত। তাদের উন্নয়নের জন্য আমরা নিম্নলিখিত নীতি ও প্রজেক্ট গ্রহণ করবো।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব

- প্রবাসী বাংলাদেশিদের পূর্ণ ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হবে, যাতে তারা জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন।
- প্রবাসী নাগরিকদের নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সংসদ ও সরকারে প্রবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে।
- বিদেশে জন্ম নেয়া দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের বাংলাদেশী বংশোদ্ভূতদের নাগরিকত্ব গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজ করা হবে।
- জুলাই আন্দোলনে প্রবাসীদের ভূমিকা ও ত্যাগের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।

দূতাবাস ও মন্ত্রণালয়ের সেবা কার্যক্রম

- প্রবাসী বাংলাদেশিদের নাগরিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও সেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সংস্কারের জন্য সংস্কার কমিশন গঠন করা হবে।
- একটি "ডায়াস্পোরা ডিজিটাল পোর্টাল" (ওয়ান-স্টপ সার্ভিস) গড়ে তোলা, যেখানে পাসপোর্ট, এনআইডি, জন্মনিবন্ধন, কনস্যুলার সেবা, সার্টিফিকেট ইকুইভালেন্স, বিনিয়োগ ইত্যাদি সবকিছু অনলাইনে করা যাবে। প্রবাসীদের পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিসহ অন্যান্য সেবার খরচ কমানো হবে।
- বিদেশে বাংলাদেশের প্রতিটি দূতাবাসে পৃথক নাগরিক সেবা ও সুরক্ষা বিভাগ তৈরি করা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া। প্রয়োজনের ভিত্তিতে কনসুলার অফিসের সংখ্যা বাড়ানো হবে।
- জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন ২০২৩ সংশোধন করে প্রবাসী নাগরিকদের জন্য একটি স্বতন্ত্র ক্যাটাগরি তৈরি করা হবে। এই ক্যাটাগরির আওতায় প্রবাসীরা অনলাইনে দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পাসপোর্ট, এনআইডি, জন্ম নিবন্ধন, কনস্যুলার সহায়তা, ওয়েজ আর্নার্স মেম্বারশিপ ইত্যাদি সেবা পেতে সহজে সক্ষম হবেন।
- দূতাবাস ও কনসুলেটে হয়রানি প্রতিরোধে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য বিশেষায়িত সেল গঠন করা হবে। এই সেল দ্রুত স্বাধীন তদন্তের এখতিয়ার রাখবে এবং অভিযোগকারীর গোপনীয়তা রক্ষা করবে।
- দূতাবাসের সেবার মান পর্যবেক্ষণের জন্য প্রবাসী কমিউনিটির অংশগ্রহণে "সিটিজেন সার্ভিস মনিটরিং বোর্ড" গঠন করা হবে।
- বিদেশে সংকটে পড়া প্রবাসীদের জন্য প্রত্যেকটি দেশে জরুরি আইনি সেবা ও অর্থনৈতিক সহায়তা তহবিল গঠন করা হবে।

মানবপাচার রোধ, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন

- দালাল ও প্রতারণা বন্ধে বিদ্যমান আইনের সর্বোচ্চপ্রয়োগ ও কঠোর শাস্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- বিদেশে মৃত্যুবরণকারী নাগরিকদের মরদেহ হয়রানিমুক্তভাবে এবং সরকারি খরচে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করা হবে। রাষ্ট্রীয় মৃতদেহ এসকোর্ট সার্ভিসের আওতায় বিমান বন্দরে কার্গো টার্মিনালের পাশে একটি পৃথক ব্যবস্থা করা হবে।
- বিদেশফেরত শ্রমিকদের জন্য পুনর্বাসন ও সম্মানজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা খাতে আলাদা বরাদ্দ ও "ডিজিটাল স্কিল সার্টিফিকেশন ও পুনঃপ্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম" চালু করা হবে।
- মানবপাচার, শ্রমিক নির্যাতন ও অধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে কঠোর আইনগত ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। নারী প্রবাসীদের জন্য যৌন হয়রানি ও নির্যাতন রোধে দূতাবাসে বিশেষ নারী সেল গঠন করা।
- বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য মৃত্যু, আহত ও চাকরি হারানোর বীমা চালু করা হবে।
- প্রবাসী ডাক্তার, গবেষক, স্বাস্থ্য-উদ্যোক্তা ও দেশের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে প্রবাসীদের জন্য টেলি-মেডিসিন সার্ভিস তৈরি করা হবে।
- প্রবাসে কারাবন্দী বাংলাদেশীদের দ্রুত দেশে প্রত্যাবর্তন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বিমানবন্দরের অবকাঠামো ও বাংলাদেশ বিমানের সেবার মানোন্নয়ন

- বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং ও যাত্রীসেবা উন্নয়ন করা হবে, যাতে প্রবাসী যাত্রীরা উন্নত মানের সেবা পায়। যাত্রীসেবায় নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হবে।
- প্রবাসীদের সাথে দুর্ব্যবহারের যে কোন অভিযোগে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে ভূমিকা পালনে বিমানবন্দরের প্রবাসী হেল্প ডেস্ককে আরও কার্যকর করা হবে।
- বিমান টিকিট সিন্ডিকেট ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধে টিকিট প্রদানকারী এজেন্সিদের কঠোর জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসা হবে।
- প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের পরিমাণের বিপরীতে RemitMiles নামে ট্রাভেল মাইলস প্রদান করা হবে। এই মাইলস ব্যবহার করে বাংলাদেশ বিমানে মূল্য ছাড়, অতিরিক্ত লাগেজ পরিবহন, লাউঞ্জ এবং আপগ্রেড ইত্যাদি সুবিধা গ্রহণ করা যাবে।

অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি, বিনিয়োগ ও সুরক্ষা

- প্রবাসীদের রেমিট্যান্স অ্যাকাউন্টের বিপরীতে ক্রেডিট স্কোরিং পদ্ধতি চালু করে স্বল্পসুদে ঋণ, আকর্ষনীয় সঞ্চয় স্কিম, বিনিয়োগ সুবিধা ও পেনশন স্কিম প্রাপ্তির জন্য ডিজিটাল প্রবাসী অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হবে।
- প্রবাসীর পরিবারের সদস্যদের সামাজিক ও আইনি জটিলতায় সহায়তার জন্য প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে হেল্প সেন্টার গঠন করা হবে।
- উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগে সহায়তা এবং দেশি-বিদেশি অংশীদারিত্বের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

- দেশে অর্জিত অর্থ বৈধ উপায়ে বিদেশে আনার প্রক্রিয়া সহজ করা হবে।

রিভার্স ব্রেইন ড্রেইন

- বাংলাদেশ সরকারের অধীনে বিদেশে অবস্থানরত প্রফেশনালদের দেশের কাজে সম্পৃক্ত করতে স্থায়ী রিভার্স ব্রেইন ড্রেইন প্রোগ্রাম চালু করা হবে।
- বিদেশী ডিগ্রি ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়নে সেক্টর ভিত্তিক দক্ষতার সমন্বয় ও টেকসই কাঠামো গড়ে তোলা হবে।
- সরকারি চাকরিতে প্রবাসীদের আগ্রহী করতে প্রশাসনিক উচ্চপদে সরাসরি যোগদানের সুযোগ তৈরি ও আন্তর্জাতিক মানের নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।
- বিদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য রিসার্চ ফেলোশিপ/গ্রান্ট চালু করা হবে, যাতে তারা দেশে ফিরে যোগ্য পদমর্যাদায় গবেষণায় অংশ নিতে পারেন। (বিস্তারিত শিক্ষা দফায়)
- বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী প্রফেশনালদের জন্য Global Bangladeshi Talent Network (GBTN) নামে একটি সরকারি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এর মাধ্যমে প্রবাসী বিশেষজ্ঞরা প্রজেক্টভিত্তিক বা পরামর্শমূলকভাবে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে পারবেন।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অন্তর্ভুক্তি

- প্রবাসী নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়ন, সামাজিক সংহতি ও সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি দেশে ‘বাংলাদেশ সেন্টার’ প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই সেন্টারের মাধ্যমে প্রবাসীদের ভাষা, আইটি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষাণের মাধ্যমে স্কিল ডেভেলপমেন্টের ব্যবস্থাও করা হবে।
- প্রবাসী শিশুদের বাংলা ভাষা ও ইতিহাস শেখাতে অনলাইন কারিকুলাম ও শিক্ষা অ্যাপ তৈরি করা হবে ।
- দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের বাংলাদেশীদের জন্য ভাষা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রোগ্রাম আয়োজন করা এবং ৩–৬ মাসের ফেলোশিপে দেশে কাজ করার সুযোগ তৈরি করা হবে।
- বিশ্বের বড় বড় শহরে বর্ষবরণ ও নবান্ন উৎসব উন্মুক্ত স্থানে আন্তর্জাতিক পরিসরে উদযাপন করা হবে।

১০। পরিবেশ, জ্বালানি ও টেকসই উন্নয়ন

পরিচ্ছন্ন শিল্প, নদী-খাল পুনরুদ্ধার ও নীল জলজ অর্থনীতির ভিত্তি

শিল্পায়নের সঙ্গে প্রকৃতি ও জল-পরিবেশের সুদৃঢ় ভারসাম্য ছাড়া টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিল্পবর্জ্য (~১৫%দূষণ উৎস) ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতা সরাসরি নদী-খাল, ভূগর্ভস্থ পানি, কৃষি উৎপাদন, মৎস্য সম্পদ ও জনস্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে উন্নয়ন লাভজনক হলেও তার সামাজিক ও পরিবেশগত খরচ বহুগুণে বেড়ে যায়। এই বাস্তবতায় প্রতিটি শিল্পকারখানায় কার্যকর 'এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট' (ETP) বাধ্যতামূলক করা এবং সেটির প্রকৃত কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে নিয়মিত তদারকি করা হবে। যদিও অধিকাংশ শিল্পে ইটিপি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক, বাস্তব প্রয়োগের ঘাটতি একটি বড় সমস্যা। তাই শিল্পাঞ্চলভিত্তিক ক্লাস্টার ETP মডেল চালু করে প্রথম ২-৩ বছর সরকার অপারেশন খরচ আংশিক বহন বা কর–সুবিধা দেবে; পরবর্তী সময়ে পূর্ণ ব্যয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান বহন করবে। একই সঙ্গে কার্যকর নজরদারি, স্বচ্ছ পরিবেশ অডিট এবং ইটিপি অকার্যকর থাকলে দৃশ্যমান শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে, যাতে আইন প্রয়োগ ঘুষনির্ভর না হয়ে বাস্তব ও বাধ্যতামূলক হয়। প্রথম ৬ মাসে শোধিত পানির জন্য বর্তমান ওয়াটার কোয়ালিটি ক্রাইটেরিয়ার পুণর্মূল্যায়ন এবং বৈশ্বিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে। কেবল কাগুজে অনুমোদন বা সার্টিফিকেটে সীমাবদ্ধ না থেকে IoT সেন্সর, অনলাইন ড্যাশবোর্ড, র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং ও তৃতীয়পক্ষ অডিটের সমন্বয়ে একটি কঠোর ও বিশ্বাসযোগ্য কমপ্লায়েন্স ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা হবে।

শিশুস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সীসা দূষণ রোধে রঙ, খেলনা ও ভোক্তা সামগ্রীতে সীসার ব্যবহার নিষিদ্ধ ও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হবে এবং বিএসটিআই কর্তৃক মান ও বাজার তদারকি জোরদার করা হবে। একই সঙ্গে ব্যাটারি-চালিত যানবাহনের ব্যবহৃত ব্যাটারি নিরাপদভাবে সংগ্রহ ও নিষ্পত্তির জন্য অনুমোদিত রিসাইক্লিং ও ডাম্পিং ফ্যাসিলিটি চালু করে অনিয়ন্ত্রিত ব্যাটারি ফেলা বন্ধ করা হবে।

অনিয়ন্ত্রিত দখল, শিল্প ও গৃহস্থালি বর্জ্য ফেলা, এবং অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে দেশের অসংখ্য নদী-খাল আজ মৃতপ্রায়। এই সংকট সমাধানে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। হাইড্রোগ্রাফিক ডেটা, স্যাটেলাইট ইমেজিং ও কমিউনিটি-ভিত্তিক ম্যাপিং ব্যবহার করে অগ্রাধিকারভিত্তিক ড্রেজিং ও পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা নেয়া হবে। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনতে উপনদীর সংযোগ পুনঃস্থাপন, প্লাবনভূমি সংরক্ষণ এবং বন্যা সমভূমিতে অপরিকল্পিত উন্নয়ন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। নদী ব্যবস্থাপনায় বেসিন-ভিত্তিক পরিকল্পনা গুরুত্ব দেয়া হবে কারণ একটি স্থানে হস্তক্ষেপ অন্য অঞ্চলে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

তিস্তা নদীর ন্যায্য পানি বণ্টন নিশ্চিত করা এবং উত্তরাঞ্চলের কৃষি, জীবনযাত্রা ও পরিবেশগত নিরাপত্তা রক্ষায় তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্পকে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে পুনর্গঠন করা হবে। আধুনিক হাইড্রোলজিক্যাল ডেটা, ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ডিজাইন ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের ভিত্তিতে ব্যারাজের সংস্কার ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা হবে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক নদী কূটনীতির মাধ্যমে তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

নদী ও জলাশয় পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে নীল জলজ অর্থনীতির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো হবে। নদীভিত্তিক মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে মাছের প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ, প্রজনন মৌসুমে কার্যকর 'নো-টেক' জোন পরিচালনা, স্বল্পব্যয়ের কোল্ড-চেইন অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বৈজ্ঞানিক স্টক-অ্যাসেসমেন্ট করা হবে। স্থানীয় জেলেদের দক্ষতা উন্নয়ন, সাশ্রয়ী অর্থায়ন ও বাজার সংযোগ জোরদারের মাধ্যমে নদীভিত্তিক জীবিকা টেকসই করা হবে। পাশাপাশি ইকোট্যুরিজম, ছোট নৌপরিবহন ও নদীতীরভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিকাশ উৎসাহিত করার মাধ্যমে আমরা নদী-অর্থনীতিকে বহুমাত্রিক রূপ দেব।

শিল্পোন্নয়ন ও নদী রক্ষায় প্রয়োজন সমন্বিত শাসন মডেল। পরিবেশ অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার, শিল্পসমিতি, বিশ্ববিদ্যালয় ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী টাস্কফোর্স গঠন করা হবে। এই টাস্কফোর্সের অধীনে একটি উন্মুক্ত তথ্যপোর্টাল থাকবে, যেখানে দূষণের রিয়েল-টাইম ডেটা, ড্রেজিংয়ের অগ্রগতি, মামলা-মোকদ্দমার অবস্থা এবং শিল্পভিত্তিক কমপ্লায়েন্স স্কোর প্রকাশ করা হবে।

নিরাপদ পানি ও পরিষ্কার বাতাস

বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ দীর্ঘদিনের একটি জটিল সংকট। এর সমাধানে কেবল প্রযুক্তিগত নয়, এটি শাসনব্যবস্থা, পরিকল্পনা ও জনসম্পৃক্ততায় গুরুত্ব দেয়া হবে। আর্সেনিকপ্রবণ এলাকার স্থানীয় বাস্তবতার আলোকে ডিপ টিউবওয়েল, পাইপ-নেটওয়ার্ক, কমিউনিটি-ভিত্তিক আর্সেনিক রিমুভাল ইউনিট, রেইনওয়াটার হারভেস্টিং বা সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ইত্যাদির সমন্বয়ে কার্যকর সমাধান নিশ্চিত করা হবে। নাগরিক যেন নিজ নিজ পানির উৎস সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারেন, সেই লক্ষ্যে পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় নিয়মিত টেস্টিং, ল্যাব সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ড্যাশবোর্ডে ফলাফল প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হবে।

শহরাঞ্চলে সবচেয়ে বড় পরিবেশগত ঝুঁকিগুলোর একটি হলো বায়ুদূষণ। ইটভাটা, ফিটনেসবিহীন যানবাহন, সড়কের ধুলা, নির্মাণকাজ ও শিল্পকারখানা সব মিলিয়ে বড় শহরগুলোর PM2.5 মাত্রা শীতকালে বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এই সংকট মোকাবিলায় দূষণকারী ইটভাটা (~৪০% দূষণ উৎস) পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে জ্বালানি-সাশ্রয়ী ও পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তিতে রূপান্তর আমাদের অগ্রাধিকার। বড়বড় শহর ও তার আশেপাশের এলাকাকে আমরা "No Brick-Kiln Zone" ঘোষণা করবো। জিগ-জ্যাগ, হাইব্রিড হফম্যান কিল্‌ন, ভার্টিক্যাল শ্যাফট কিল্‌ন বা বিকল্প নির্মাণ উপকরণ, যেমন অটোক্লেভড এরিয়েটেড কংক্রিট ব্লক ইত্যাদিতে নীতিগত প্রণোদনার দেয়া হবে। নির্মাণ শিল্পে (~১৫% দূষণ উৎস) দরপত্র ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় 'গ্রিন ক্রাইটেরিয়া' যুক্ত করার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তিতে রূপান্তর দ্রুততর করা হবে। এনসিপি চার বছরে ধাপে ধাপে প্রতি বছর ২৫% করে সকল গণপরিবহনের ইঞ্জিনে কার্বন নিঃসরণ রেটিং চালু ও পুরনো, দূষণকারী ইঞ্জিন প্রতিস্থাপন নিশ্চিত করবে যানবাহন (~৩০% দূষণ উৎস) যাতে নগর বায়ুদূষণ দ্রুত ও টেকসইভাবে কমানো যায়।

কার্যকর Air Quality Management (AQM) ব্যবস্থার জন্য বিজ্ঞানসম্মত সোর্স-অ্যাপোর্শন স্টাডি, রিয়েল-টাইম মনিটরিং স্টেশন, ব্যাক-এন্ড ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। নগরের

দূষণ-হটস্পটে, বিশেষ করে স্কুল, হাসপাতাল ও বয়স্কদের সেবাকেন্দ্রের আশপাশে, মাইক্রো-স্কেল এয়ার পিউরিফিকেশন সিস্টেম পাইলট প্রকল্প হিসেবে চালু করে কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হবে। তবে এয়ার পিউরিফায়ার মূল সমাধান নয়, বরং সাময়িক উপশম। দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হলো উৎসে দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, সড়কের ধুলা ব্যবস্থাপনা, নির্মাণস্থলে কভারিং এবং যানবাহনের নির্গমন মানদণ্ডের কঠোর প্রয়োগ।

নিরাপদ পানি ও পরিষ্কার বায়ু এই দুই ক্ষেত্রেই শাসনব্যবস্থা ও ডেটা স্বচ্ছতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিটি কর্পোরেশন, WASA, পরিবেশ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর মধ্যে নিয়মিত ডেটা শেয়ারিং ও যৌথ পরিকল্পনা নিশ্চিত করা হবে। স্কুল কারিকুলামে পানি-স্বাস্থ্য, বায়ুগুণমান ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে সচেতন নাগরিক তৈরি করা হবে। পাশাপাশি সামাজিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ও দরিদ্র এলাকায় ফ্রি মাস্ক বিতরণ, স্বাস্থ্যপরামর্শ এবং পানি টেস্টিং ক্যাম্প নিয়মিত চালু রাখা হবে।

নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) সবার মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করা হবে এবং শহর–গ্রাম ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে। নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য জেন্ডার–সংবেদনশীল WASH ও মাসিক স্বাস্থ্যবিধি (MHM) সুবিধা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হবে। WASH খাতে বাজেট বৃদ্ধি, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পানি প্রযুক্তিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। জলবায়ু–সহনশীল WASH অবকাঠামো, উদ্ভাবন ও CSR-এর নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলক করে টেকসই সেবা নিশ্চিত করা হবে।

বৈচিত্র্যময় জ্বালানি মিশ্রণ

উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে সবচেয়ে বড় কৌশলগত অগ্রাধিকারগুলোর একটি হলো জ্বালানি নিরাপত্তা। আমদানিনির্ভর জীবাশ্ম জ্বালানির মূল্য অস্থিরতা এবং কার্বন নিঃসরণ কমানোর আন্তর্জাতিক চাপ এই দ্বৈত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় টেকসই উত্তরণের পথ হলো বৈচিত্র্যময় জ্বালানি মিশ্রণ। আমাদের লক্ষ্য, পাঁচ বছরের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্তত ২০% শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে অর্জন।

শক্তিশালী Integrated Resource Planning (IRP), বাস্তবসম্মত লোড ফোরকাস্ট, গ্রিড আপগ্রেড, স্টোরেজ প্রযুক্তি ও পূর্বানুমেয় বাজার প্রণোদনার মাধ্যমে ওভারক্যাপাসিটি ও আর্থিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং বিদ্যমান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি চুক্তি বাজার বাস্তবতা ও পরিবেশ–সামাজিক প্রভাব বিবেচনায় পর্যালোচনা করা হবে। কর্মদক্ষতা–ভিত্তিক পেমেন্ট কাঠামো চালু করে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ স্তরে SAIDI/SAIFI উন্নয়ন, সিস্টেম লস হ্রাস ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের সঙ্গে আর্থিক প্রণোদনা ও জরিমানা যুক্ত করা হবে। স্মার্ট গ্রিড ব্যবস্থার মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরে সিস্টেম লস ১০–১২% থেকে ৫–৬%-এ নামিয়ে এনে শিল্পখাতে বিদ্যুতের পিক ট্যারিফ ১৫ টাকা থেকে ১৩ টাকা এবং অফ-পিক ১১ টাকা থেকে ৯ টাকায় নামানোর লক্ষ্য নেওয়া হবে। নতুন বাণিজ্যিক ভবন ও সরকারি স্থাপনায় রুফটপ সোলার বাধ্যতামূলক/প্রণোদনাভিত্তিক করা হবে এবং কৃষিজমি সুরক্ষায় ফ্লোটিং, ক্যানাল-টপ, অ্যাগ্রিভোল্টাইক ও নদীতীরভিত্তিক সোলার প্রকল্প সম্প্রসারণ করা হবে। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদি Wind Resource Assessment-এর

ভিত্তিতে বায়ুশক্তি উন্নয়ন করা হবে এবং ব্যাটারি স্টোরেজ, পাম্পড-হাইড্রো ও ডিমান্ড রেসপন্সের মাধ্যমে গ্রিডের স্থিতিশীলতা বাড়ানো হবে। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ সাশ্রয়কে ‘চতুর্থ জ্বালানি’ হিসেবে ধরে একটি জাতীয় Energy Efficiency Master Plan বাস্তবায়ন করা হবে, যেখানে শিল্পকারখানায় ফুয়েল–এফিশিয়েন্ট প্লান্ট ও প্রযুক্তি স্থাপনে বিশেষ ঋণ ও প্রণোদনার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে ১০–১৫% বিদ্যুৎ সাশ্রয় এবং শিল্পখাতের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনা

টেকটোনিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ ভূমিকম্পের উচ্চ ঝুঁকিতে আছে। একই সাথে দ্রুত নগরায়ণের ফলে ভূমিকম্প পরবর্তী ঝুঁকিও ক্রমাগত বাড়ছে। মানুষের জীবন, সম্পদ ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো রক্ষার্থে আমাদের লক্ষ্য হলো ঝুঁকি হ্রাস, ভবন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, উদ্ধার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জাতীয় পর্যায়ে টেকসই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রস্তাবনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-এর নেতৃত্বে বাস্তবায়িত হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগত, স্থানীয় ও জরুরি সংস্থা একসাথে সমন্বয় করে কাজ করবে।

১। ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কই সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায়। উচ্চমাত্রার ভূমিকম্পের পর প্রথম ৩০ মিনিটকে বিশেষজ্ঞরা বলেন “Golden Time”, কারণ এই সময়ে নেওয়া সঠিক পদক্ষেপ জীবন বাঁচাতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। ভূমিকম্পের সময় কী করতে হবে তা যেন দেশের প্রতিটি পরিবার জানে, সেটা নিশ্চিত করতে

- প্রতিটি স্কুলে নিয়মিত ভূমিকম্প মহড়া করতে হবে, যাতে শিশুরা ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কিত না হয়ে কী করতে হবে তা অভ্যাস হিসেবে রপ্ত করতে পারে।
- প্রতিটি গ্রাম ও মহল্লায় সেচ্ছাসেবীদের নিয়ে একটি কমিউনিটি রেসপন্স টিম গঠন করতে হবে। উদ্ধারকারী বাহিনী পৌঁছানোর আগেই তারা দ্রুত প্রাথমিক সহায়তা দিবে ও আশেপাশের মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরাতে পারবে।
- টেলিভিশন, অনলাইন ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে জাতীয় জনসচেতনতা ক্যাম্পেইন চালাতে হবে। এই উদ্দেশ্য থাকবে ভূমিকম্প হলে পরিবারের সদস্যদের নিরাপদে রাখতে প্রথম কয়েক সেকেন্ড কী করতে হবে সে বিষয়ে প্রতিটি পরিবারকে সচেতন করে তোলা।

২। প্রথম ৬ মাসের মধ্যে জরুরী সময়ে উদ্ধার কাজ ও অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য ফায়ার সারভিস ও সিভিল ডিফেন্স, পুলিশ, ও অন্যান্য বাহিনীর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

৩। ভূমিকম্প ঝুঁকি হ্রাসে ৬ মাসের মাঝে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ স্থপতি, নগর পরিকল্পক, সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই টাস্কফোর্সের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাসে গবেষণালব্ধ পরামর্শ দিবেন।

৪। বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC 2020)-এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং 100% নতুন ভবন কোড-সম্মত করা

BNBC 2020-এর কঠোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। Building Regulatory Authority (BRA) অবিলম্বে গঠন করা হবে, যা দেশে সকল ভবনের BNBC মান অনুসরণ নিশ্চিত করবে। নির্মাণকালে কোড লঙ্ঘন ধরা

পড়লে কাজ বন্ধের নির্দেশ, অনুমোদন বাতিল এবং প্রয়োজন হলে ভবন ভাঙার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোড লঙ্ঘনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আইন অনুযায়ী শাস্তির আওতায় আনা হবে।

৫। ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ স্কুল, কলেজ, হাসপাতালের কমপক্ষে ৬০% রেট্রোফিট বা পুনর্নির্মাণ করা হবে

ঢাকা এবং অন্যান্য প্রধান শহরে বিদ্যমান ভবনগুলোর কাঠামোগত সমীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। প্রায় ৬৫% ভবন ১৯৯০ সালের আগে নির্মিত এবং এগুলোর মধ্যে ৫০-৬০% ঝুঁকিপূর্ণ। সমীক্ষায় ভিজ্যুয়াল রেটিং মেথড ব্যবহার করে ভবনগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হবে: ভালো অবস্থা, মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যেসব ভবন রেট্রোফিট করা সম্ভব নয়, সেগুলো ধ্বংস করে পুনঃনির্মাণ করতে হবে। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ সরকারি ভবন যেমন হাসপাতাল, স্কুল ও প্রশাসনিক ভবনগুলোতে বাধ্যতামূলক রেট্রোফিটিং প্রয়োগ করা হবে। বেসরকারি ভবনের জন্য স্বল্পসুদে ঋণ, কর রেয়াত এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে প্রণোদনা দেওয়া হবে।

৬। ২ বছরে ঢাকা ও চট্টগ্রামে ২০টির অধিক নতুন সিসমিক মনিটরিং স্টেশন স্থাপন করা

বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক বাস্তবতা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, বিশেষ করে blind faults এবং নতুন সিসমোটেকটনিক ঝুঁকির কারণে। Blind faults, plate boundary dynamics এবং seismotectonics নিয়ে বিশদ গবেষণা করার জন্য একটি জাতীয় গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে। ঢাকা, নরসিংদী, গাজীপুরসহ কেন্দ্রীয় অঞ্চলে কমপক্ষে ২০টি নতুন seismic monitoring stations স্থাপন করা হবে, যা মাইক্রোজোনেশন mapping এবং মাটির কম্পন ও তরলীকরণ ঝুঁকি নির্ধারণে সহায়ক হবে।

৭। ১ বছরের মাঝে সব বিভাগীয় শহরে International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) এর মান অনুযায়ী শহরাঞ্চলের জন্য উদ্ধারকারী দল (Medium Urban Search and Rescue) টিম গঠন করা হবে

৮। ৫ বছরে নগরভিত্তিক Earthquake Hazard Zoning সম্পন্ন এবং মাস্টার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে

শহরের পরিকল্পনা ও Zone-based earthquake hazard mapping বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরি। সব উন্নয়ন কার্যক্রম মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী হবে এবং ভূমিকম্প ঝুঁকি অনুযায়ী zoning করা হবে। সংকীর্ণ রাস্তা ও দুর্বল নাগরিক পরিষেবা এলাকায় ভবন উচ্চতা এবং ফ্লোর এরিয়া রেশিও (FAR) সীমিত করা হবে; উদাহরণস্বরূপ, ১৬ ফুটের কম চওড়া রাস্তার ক্ষেত্রে চারতলা ছাড়ানো হবে না। উত্তরা ও বসুন্ধরার বালুভরাট এলাকায় উচ্চ FAR এড়ানো হবে, অথবা BNBC 2020-এর উন্নত কাঠামোগত বিধান কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। প্রধান সড়ক ও অভ্যন্তরীণ রাস্তার ন্যূনতম প্রস্থ নিশ্চিত করা হবে যাতে জরুরি সেবা চলাচল করতে পারে। বিদ্যমান জনসাধারণের জন্য খোলা জায়গা (public open spaces) যেমন খেলার মাঠ, পার্ক, বিদ্যালয়ের মাঠ এবং অন্যান্য খোলা স্থান অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র এবং সমাবেশস্থল হিসেবে সংরক্ষণ ও প্রস্তুত করা হবে। একই সঙ্গে, ড্যাপ-এ প্রস্তাবিত নতুন পার্ক, খেলার মাঠ ও খোলা স্থান বাস্তবায়ন করা হবে এবং সেগুলোকে জরুরি রুটের সাথে সংযুক্ত রাখা হবে, যাতে বড় ভূমিকম্প বা দুর্যোগের সময় জনসাধারণের নিরাপদ স্থান নিশ্চিত করা যায়।

৯। দুই বছরে ডিজিটাল বিল্ডিং রেজিস্ট্রি তৈরি এবং রাজউক ও সিটি করপোরেশনের সাথে সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে

শহরব্যাপী একটি ডিজিটাল বিল্ডিং রেজিস্ট্রি তৈরি করা হবে, যেখানে প্রতিটি ভবনের কাঠামোগত অবস্থা, মাটি ধরন, নির্মাণের বছর, BNBC মান অনুসরণ এবং রেট্রোফিট ইতিহাস সংরক্ষিত থাকবে। রেজিস্ট্রিতে স্বতন্ত্র তৃতীয় পক্ষের সার্টিফিকেশন অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যা নিশ্চিত করবে যে ভবনগুলো BNBC-এর মান অনুসারে নিরাপদ। এই রেজিস্ট্রি ভবন রেট্রোফিটিং কার্যক্রমকে সমন্বিত, সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করবে, যার ফলে বড় ভূমিকম্পের সময় প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব হবে।

দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাস ও ব্লু ইকোনমি

দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তার অন্যতম ভিত্তি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উৎপাদন হ্রাস এবং শিল্প ও বিদ্যুৎখাতে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে গ্যাস সরবরাহে কাঠামোগত চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে নতুন অনুসন্ধান, বিদ্যমান উৎপাদন পুনরুদ্ধার এবং দক্ষ ব্যবহারের ওপর সমন্বিত ও কৌশলগত অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হবে।

নতুন গ্যাসসম্পদ আবিষ্কারের লক্ষ্যে আধুনিক সিসমিক সার্ভে, উন্নত রিজার্ভয়ার মডেলিং এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ডেটা-রুম উন্নয়নে বিনিয়োগ জোরদার করা হবে। এসব উদ্যোগ অনশোর ও অফশোর ব্লকগুলোকে বিনিয়োগবান্ধব করে তুলবে এবং বৈদেশিক ও দেশীয় বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়ক হবে। অনশোর ও অফশোর উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতামূলক বিডিং প্রক্রিয়া, স্বচ্ছ ও পূর্বানুমেয় প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (PSC) শর্তাবলি এবং শক্তিশালী পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা কাঠামো নিশ্চিত করা হবে।

আমাদের প্রস্তাব অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রমকে পর্যায়ভিত্তিকভাবে বাস্তবায়ন। Phase–1-এ প্রায় ১৫০টি কূপ খনন এবং বিস্তৃত সিসমিক জরিপ পরিচালনা করা হবে, যার আওতায় ২ডি সিসমিক সার্ভে প্রায় ৭,৭৫৫ লাইন-কিলোমিটার (LKM) এবং ৩ডি সিসমিক সার্ভে প্রায় ৫,৬৭৪ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বাস্তবায়িত হবে। Phase–2 এ বঙ্গোপসাগরের অপার সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে, একই সাথে দেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে ও বাণিজ্যিক উপযোগিতা নিশ্চিত করে একটি যুগোপযোগী 'প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট' কাঠামো তৈরি করা হবে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন কোম্পানিগুলোকে অফশোর গ্যাস উত্তোলনে উৎসাহিত করে আগামী ৫ বছরের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হবে। পাশাপাশি দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জ্বালানি খাতে স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করা হবে। স্বল্পমেয়াদে ঘাটতি মোকাবিলার জন্য ফ্লোটিং স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট (FSRU)-এর মাধ্যমে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) আমদানি অব্যাহত রেখে সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

বিদ্যমান গ্যাসক্ষেত্রগুলোতে ওয়ার্কওভার, ইনফিল ড্রিলিং এবং ইনহ্যান্সড গ্যাস রিকভারি (EGR) প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হবে। একই সঙ্গে গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় আধুনিক লিকেজ শনাক্তকরণ প্রযুক্তি এবং নির্ভুল মিটারিং ব্যবস্থা চালু করে আন-অ্যাকাউন্টেড-ফর গ্যাস (UFG) কমানো হবে।

গ্যাস বরাদ্দ নীতিতে উচ্চ মূল্য সংযোজনকারী ও রপ্তানিমুখী শিল্প, সার উৎপাদন এবং বিদ্যুৎখাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। আর্থিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক ন্যায্যতা একসঙ্গে নিশ্চিত করতে মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও পূর্বনির্ধারিত সূত্র প্রণয়ন, টার্গেটেড ভর্তুকি ব্যবস্থা এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সমন্বয় বজায় রাখা হবে। এছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে গ্যাসে চুলার পরিবর্তে ইলেক্ট্রিক ইন্ডাকশন কুকার ব্যবহারে উৎসাহ দেয়া হবে।

পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে মিথেন নিঃসরণ ও ফ্লেয়ারিং হ্রাস, কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানো এবং সংবেদনশীল বাস্তুতন্ত্র ও উপকূলীয় পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের নীতিগত অগ্রাধিকার হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্যাসখাতের সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবো।

ব্লু ইকোনমি বাংলাদেশের জন্য বহুমুখী সম্ভাবনার ক্ষেত্র। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণে বৈজ্ঞানিক স্টক-অ্যাসেসমেন্ট, ডেটা-ভিত্তিক নজরদারি ও সর্বোচ্চ টেকসই আহরণ (Maximum Sustainable Yield – MSY) নির্ধারণ বাধ্যতামূলক করা হবে। এর ভিত্তিতে মাছের প্রজনন মৌসুমে কার্যকর মৌসুমি নিষেধাজ্ঞা, অবৈধ ও অতিরিক্ত আহরণ রোধে আধুনিক মনিটরিং ব্যবস্থা এবং জেলে জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প জীবিকাভিত্তিক সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। একই সঙ্গে মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া (MPA) চিহ্নিতকরণ, সম্প্রসারণ ও সুরক্ষা জোরদার করে প্রবালপ্রাচীর, ম্যানগ্রোভ ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হবে। উপকূলীয় ও দ্বীপাঞ্চলে পরিবেশবান্ধব, জলবায়ু-সহনশীল ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকেন্দ্রিক পর্যটন বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে। উন্নয়নের সুফল সরাসরি উপকূলবাসীর কাছে পৌঁছাতে ইকো-ট্যুরিজম, স্থানীয় সংস্কৃতি ও জীবিকাভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।

নৌপরিবহন ও সমুদ্রবন্দর খাতে গ্রিন পোর্ট ধারণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং ডিজিটাল লজিস্টিকস চালু করা হবে। এতে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে বন্দর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আঞ্চলিক ট্রানজিট সম্ভাবনা কাজে লাগানো সম্ভব হবে। শিপবিল্ডিং ও শিপ-রিপেয়ার খাতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাস্টার গড়ে তুলে প্রযুক্তি স্থানান্তর, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও রপ্তানিমুখী উৎপাদন উৎসাহিত করা হবে। এই শিল্পকে অর্থায়ন, গবেষণা ও আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন সহায়তার মাধ্যমে বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা হবে।

ইলেকট্রিক ভেহিকল (EV) রূপান্তর

পরিবহন খাত বাংলাদেশের তিনটি বড় সংকটের কেন্দ্রবিন্দু হলো কার্বন নিঃসরণ, আমদানিনির্ভর জ্বালানি ব্যয় এবং নগরের বায়ুদূষণ। ইলেকট্রিক ভেহিকল (EV) এই তিন সমস্যার কার্যকর সমাধান দিতে পারে। প্রথম ধাপে আগামী পাঁচ বছরে সরকারি যানবাহন ক্রয়ের অন্তত ৪০ শতাংশ EV করার বাধ্যবাধকতা স্থাপন করা হবে। ফলে বাজারে একটি শক্তিশালী ‘অ্যাঙ্কর ডিমান্ড’ তৈরি হবে এবং স্থানীয় সার্ভিসিং, চার্জিং, যন্ত্রাংশ ও সফটওয়্যারভিত্তিক সহায়ক শিল্প গড়ে উঠবে এবং বেসরকারি বিনিয়োগের ঝুঁকি কমবে।

বেসরকারি খাতে EV রূপান্তরের জন্য ধাপে ধাপে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। যেমন আমদানি শুল্ক পুনর্বিন্যাস, রেজিস্ট্রেশন ও টোল সুবিধা, পুরোনো দূষণকারী যান স্ক্র্যাপেজ ইনসেনটিভ এবং স্বল্পসুদে অর্থায়ন। বিশেষত বাস, ট্যাক্সি, রাইড শেয়ারিং ও ডেলিভারি ভ্যানের মতো ফ্লিটভিত্তিক সেবায় EV দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে। দেশের ৪–৫ মিলিয়ন অটো-রিকশার লিড-অ্যাসিড ব্যাটারি ধাপে ধাপে লিথিয়াম-আয়ন প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা হবে, যেখানে আধুনিক যানবাহনের সকল নিরাপত্তা ও মানসম্পন্ন রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করা হবে। এই কনভার্শনের জন্য চালকদের সহজ শর্তে স্বল্প সুদের ঋণ দেওয়া হবে।

চার্জিং অবকাঠামোর জন্য শহরে অফিস, মল, পার্কিংয়ে ডেস্টিনেশন চার্জিং, মহাসড়কে ফাস্ট-চার্জিং করিডর এবং বাস ডিপোতে মেগাওয়াট-স্কেল চার্জার এই 'মিশ্র মডেল' গড়ে তোলা হবে। ইন্টারঅপারেবল মান, স্মার্ট বিলিং ও "চার্জিং অ্যাজ এ সার্ভিস" প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা হবে। তাছাড়া সোলার ক্যানোপি ও ব্যাটারি স্টোরেজভিত্তিক চার্জিং এ প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমে গ্রিডের ওপর চাপ কমানো হবে।
গ্রিড প্রস্তুতিতে অফ-পিক ট্যারিফ, স্মার্ট মিটারিং, ডিমান্ড রেসপন্স এবং বড় শহরে সাবস্টেশন ও কেবল আপগ্রেড করা হবে। ভবিষ্যৎ পরিবেশঝুঁকি কমাতে ব্যাটারির রিসাইক্লিং ও সেকেন্ড-লাইফ ব্যবহারের নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। উৎপাদকদের বাধ্যতামূলক সংগ্রহ ও রিসাইক্লিং (EPR) নিশ্চিত করা হবে, ব্যবহৃত ব্যাটারির সেকেন্ড-লাইফ ব্যবহার চালু করা হবে এবং অনিরাপদ রিসাইক্লিং নিষিদ্ধ করা হবে। নিরাপদ সংগ্রহব্যবস্থা, আধুনিক প্রযুক্তি ও কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যাটারিকে বর্জ্য নয়, পুনঃব্যবহারযোগ্য সম্পদে রূপান্তর করা হবে।

নাগরিক চলাচল ও সমন্বিত গণপরিবহন

নাগরিকের নির্বিঘ্ন চলাচল একটি মৌলিক অধিকার এবং একটি কার্যকর রাষ্ট্র ও সচল অর্থনীতির পূর্বশর্ত। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ভিআইপি সংস্কৃতি, অপরিকল্পিত নগরায়ন, ঢাকাকেন্দ্রিক কর্মসংস্থান ও অবকাঠামো, বিশৃঙ্খল গণপরিবহন এবং সড়কনির্ভর পণ্য পরিবহনের ফলে রাজধানী ঢাকা বসবাস ও কর্মক্ষমতার দিক থেকে অতিরিক্ত চাপে পড়েছে। সময়, উৎপাদনশীলতা, জ্বালানি ও পরিবেশ সব ক্ষেত্রেই এর মূল্য দিচ্ছে সাধারণ মানুষ। এনসিপির অন্যতম অগ্রাধিকার নগর চলাচল, গণপরিবহন, মেট্রোরেল ও রেল ব্যবস্থায় কাঠামোগত সংস্কার।

বাংলাদেশের পরিবহন সংকট শুধু যানজটের সমস্যা নয়; এটি সময়, জীবন, জ্বালানি ও অর্থনীতির ওপর একটি কাঠামোগত চাপ। এই সংকট থেকে উত্তরণে আমরা পরিবহন ব্যবস্থাকে মানুষের জীবন, নিরাপত্তা ও সময়কে কেন্দ্র করে পুনর্গঠন করবো। আমাদের জাতীয় লক্ষ্য Vision 50% অর্থাৎ, আগামী পাঁচ বছরে ৫০% যানজট হ্রাস, ৫০% সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি কমানো এবং ৫০% সময় ও জ্বালানি অপচয় কমিয়ে একটি নিরাপদ, দক্ষ ও মানবিক পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্য অর্জনে প্রথম নীতি হবে "Measure First"; কারণ যা মাপা যায় না, তা কমানো যায় না। ট্রাফিক প্রবাহ, দুর্ঘটনা, যাতায়াত সময় ও বিলম্ব সংক্রান্ত ডেটা নিয়মিত সংগ্রহ ও প্রকাশ করা হবে এবং একটি উন্মুক্ত Transportation Performance Dashboard-এর মাধ্যমে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করা হবে; রাস্তা নির্মাণ, সিগন্যাল স্থাপন ও আইন প্রয়োগসহ সব হস্তক্ষেপ হবে ডেটার ওপর ভিত্তি করে, অনুমানের ওপর নয়। Vision

50%–এর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি হিসেবে DTCA–র সঙ্গে সমন্বয়ে একটি দক্ষ ও ক্ষমতাসম্পন্ন National Transport Coordination Authority (NTCA) গঠন করা হবে, যা ডেটা মনিটরিং, সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সমন্বয় এবং পাবলিক ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে নাগরিক জবাবদিহি নিশ্চিত করবে।

এই লক্ষ্য অর্জনে অবকাঠামোগত (hard infrastructure) হস্তক্ষেপের আগে সফট মেজারস যেমন Travel Demand Management (TDM), Urban Parking Policy বাস্তবায়ন, ডিমান্ড–ভিত্তিক পার্কিং ফি, ডিজিটাল পার্কিং ব্যবস্থাপনা, নির্ধারিত লোডিং–আনলোডিং সময়, Transportation Asset Management ইত্যাদিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। একই সঙ্গে স্বল্প সময়ের মধ্যেই এসব সফট মেজারস দ্রুত বাস্তবায়নে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে, যাতে তাৎক্ষণিকভাবে যানজট হ্রাস ও চলাচলে স্বস্তি নিশ্চিত করা যায়।

ট্রাফিকের ক্ষেত্রে ভিআইপি (Very Important Person) সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারণ করা হবে। ভিআইপি ট্রাফিক সুবিধা শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী, ও রাষ্ট্রীয় অতিথির জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে। মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা বা রাজনৈতিক নেতাদের জন্য কোনোভাবেই রাস্তা বন্ধ, যানজট সৃষ্টি কিংবা বিশেষ ট্রাফিক প্রোটোকল কার্যকর করা যাবে না। জনসাধারণের চলাচল ও ট্রাফিক প্রবাহ সর্বদা সচল রাখা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা যানবাহনকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। আধুনিক স্মার্ট সিগন্যাল ও ডিজিটাল ট্রাফিক কন্ট্রোল ব্যবস্থার মাধ্যমে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা করা হবে। ট্রাফিক পুলিশের কাজ হবে কেবল ট্রাফিক আইন বাস্তবায়ন করা।

নগর যানজট কমাতে জোনভিত্তিক স্কুল বাস ব্যবস্থা চালু করা হবে। এবং একই সঙ্গে স্কুল ও উচ্চ যানজট সৃষ্টিকারী ভবনে বাধ্যতামূলক Quick Drop/Pickup Zone ও নিজস্ব ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান কার্যকর করা হবে। শহরকে একাধিক স্কুল ট্রান্সপোর্ট জোনে ভাগ করে নির্দিষ্ট রুট ও নির্ধারিত সময়ে স্কুল বাস চলাচল নিশ্চিত করা হবে। ফলে অফিস সময়ের চাপের সঙ্গে স্কুল ড্রপের চাপ একসাথে না পরা এড়ানো যাবে। ব্যস্ত এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তিগত গাড়িতে স্কুল ড্রপ সীমিত করা হবে। প্রতিটি স্কুল বাসে জিপিএস ট্র্যাকিং বাধ্যতামূলক করে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করা হবে। যানজট কমাতে অফিস ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সময়সূচিতে স্তরভিত্তিক (staggered) পরিবর্তন আনা হবে। সরকারি অফিস, বেসরকারি খাত, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্ধারণ করা হবে, যাতে সকালের নির্দিষ্ট একটি সময়ে শহরের ওপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে। প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নমনীয় ও হাইব্রিড সময়সূচি চালু করা হবে। ঢাকার সব প্রবেশ-বহির্গমন পয়েন্টে ইন্টেলিজেন্ট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট (ITS), ডেডিকেটেড বাস/ট্রাক লেন ও সিগনাল সিঙ্ক্রোনাইজেশন চালু করে বটলনেক কমানো হবে। রিং রোড/বাইপাস দ্রুত সম্পন্ন করে ভারী যানবাহনকে ঢাকার ভেতরে ঢোকা সীমিত করা হবে এবং এন্ট্রি-পয়েন্টে ট্রাক টার্মিনাল/লজিস্টিক হাব স্থাপন করা হবে।

নারী নিরাপত্তা ও কর্মজীবী নারীদের চলাচল সহজ করতে নারী-নির্দিষ্ট দুইটি বাস সার্ভিস চালু করা হবে (বিস্তারিত “নারীর নিরাপত্তা, অধিকার ও ক্ষমতায়ন” অংশে)। গুরুত্বপূর্ণ নগর করিডোরে নির্ধারিত সময়সূচিতে এই বাসগুলো চলবে এবং

এগুলো মূল গণপরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বিত থাকবে। কর্মজীবী নারী, শিক্ষার্থী ও বয়স্ক নারীরা নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ যাতায়াত নিশ্চিত করতে প্রতিটি নারী বাসে সিসিটিভি, প্যানিক বাটন ও লাইভ ট্র্যাকিং ব্যবস্থা থাকবে।

পাসপোর্ট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশাসনিক ও কর্মসংস্থান-সংক্রান্ত সেবার জন্য ঢাকাকেন্দ্রিক যাতায়াত কমাতে সেবা বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। সার্ভিস ম্যাপিং করে কোথায় কোন সেবা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করে সঠিক স্থানে সার্ভিস সেন্টার ও আউটলেট স্থাপন করা হবে। জেলা ও উপশহরভিত্তিক নাগরিক সেবাকেন্দ্রের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত কমানো হবে। (বিস্তারিত "দুর্নীতি প্রতিরোধে স্বচ্ছতা, সুশাসনে ডিজিটাইজেশন ও যোগ্যতা" অংশে)।
প্রাণহানিকে "সড়ক দুর্ঘটনা" নয়, "সড়ক মৃত্যু" হিসেবে নথিভুক্ত করা হবে; যাতে নকশা, অব্যবস্থাপনা ও আইন প্রয়োগে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হয়। যানপ্রবাহ সচল রাখতে প্রধান সড়ক থেকে অবৈধ দখল ধাপে ধাপে মানবিক পুনর্বাসনের মাধ্যমে অপসারণ করা হবে।

গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত ইন্টারসেকশনগুলোতে বেসিক চার-ফেজ (Four-Phase Fixed-Time) ট্রাফিক সিগন্যাল স্থাপন করা হবে। ট্রাফিক ডেটা ও জরিপের ভিত্তিতে যেখানে যে দিক দিয়ে যানবাহনের চাপ বেশি, সে দিকের জন্য তুলনামূলকভাবে বেশি সবুজ সময় বরাদ্দ করা হবে। ধাপে ধাপে এসব সিগন্যালকে ডেটা-ভিত্তিক ও অভিযোজিত (Adaptive) ব্যবস্থায় উন্নীত করা হবে, যাতে রিয়েল-টাইম যানচাপ অনুযায়ী সিগন্যাল টাইমিং সমন্বয় করা যায়। এভাবে পরিকল্পিতভাবে ধাপে ধাপে আধুনিক স্মার্ট সিগন্যাল ও ডিজিটাল ট্রাফিক কন্ট্রোল ব্যবস্থার মাধ্যমে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা করা হবে।

বাস, বিআরটি, মেট্রোরেল ও রেল একক কাঠামোর অধীনে এনে সমন্বিত গণপরিবহন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হবে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে একীভূত ট্রান্সপোর্ট অথরিটি গঠন করে রুট র‍্যাশনালাইজেশন, লাইসেন্সিং, ভাড়া কাঠামো ও সেবামান নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ফলে একটি শহরের সব গণপরিবহনে ওঠা যাবে এক টিকিটেই। সব পাবলিক বাসকে একক কর্তৃপক্ষের আওতায় আনলে অতিরিক্ত যান, দুর্ঘটনা ও অপ্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতা কমবে। সমন্বিত গণপরিবহনের টিকিট প্যাকেজে শিক্ষার্থী ও সামাজিক সুরক্ষার আওতায় থাকা ব্যক্তিরা ভর্তুকি পাবেন।

ঢাকাকে বিকেন্দ্রীকরণে মেট্রোরেল সম্প্রসারণ

রাজধানীর ওপর অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও কর্মচাপ কমাতে মেট্রোরেলকে কেবল নগরের ভেতরে সীমাবদ্ধ না রেখে আঞ্চলিক কমিউটার রেলে রূপান্তর করা হবে। এই লক্ষ্যে ধাপে ধাপে মেট্রোরেল সংযোগ সম্প্রসারণ করে ঢাকা–মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা–নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা–নরসিংদী ও ঢাকা–গাজীপুর করিডোর তৈরি করা হবে। এই সংযোগগুলোর মাধ্যমে মানুষ ঢাকার বাইরে বসবাস করেও দ্রুত, নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী গণপরিবহনে কর্মস্থলে যাতায়াত করতে পারবে। এর ফলে আবাসন, শিল্প, শিক্ষা ও সেবাখাত ধীরে ধীরে ঢাকার বাইরের জেলাগুলোতে বিস্তৃত হবে, জমির ওপর চাপ কমবে এবং রাজধানীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। মেট্রোরেল স্টেশনগুলোকে ঘিরে পরিকল্পিত ট্রানজিট-ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট (TOD) গড়ে তোলা হবে, যেখানে অফিস, আবাসন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা একসঙ্গে বিকশিত হবে।

মেট্রোরেল, বাস ও রেলের মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড টিকিটিং ও সময়সূচি সমন্বয় নিশ্চিত করা হবে। ফলে একটি কার্ড বা অ্যাপে সব পরিবহন ব্যবহারযোগ্য হবে। ট্রান্সফার হাবগুলোতে নিরাপদ হাঁটার পথ, স্পষ্ট সাইনেজ এবং নারী ও প্রতিবন্ধী-বান্ধব নির্মান নিশ্চিত করা হবে। শেষ-মাইল সংযোগে পরিকল্পিতভাবে ই-রিকশা, সাইকেল ও ই-স্কুটার যুক্ত করা হবে।

পণ্য পরিবহনে এনসিপির লক্ষ্য হলো রোড থেকে রেইলে স্থানান্তর। ড্রাই পোর্ট, আইসিডি, লজিস্টিক পার্ক ও মালবাহী রেল করিডরের মাধ্যমে দীর্ঘপথে রেল এবং শহরে লাস্ট-মাইল ট্রাক এই বিভাজন কার্যকর করা হবে। এতে জ্বালানি ব্যয় ও কার্বন নিঃসরণ কমবে এবং মহাসড়কে যানজট হ্রাস পাবে। এই রূপান্তরের ভিত্তি হিসেবে এনসিপি বাস্তবায়ন দশ বছর মেয়াদি "রেল রিভাইভাল প্ল্যান" করবে। এর অধীনে লোকোমোটিভ সংকট দূর করা, রাষ্ট্রীয় মালিকানা বজায় রেখে সার্ভিসে প্রতিযোগিতা আনতে প্রথমে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে বেসরকারি (দেশি/বিদেশি) ফ্রেইট অপারেটর কোম্পানিকে ৭ বছরের লিজ দেয়া হবে। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে অন্যান্য রুটে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানিকে লিজ দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করা হবে। মালামাল পরিবহনে ফিরিয়ে আনা হবে গার্মেন্টস সহ অন্যান্য শিল্পের আস্থা। ফ্রেইট রেল সম্প্রসারণ এবং ভবিষ্যৎ ইলেকট্রিক রেলের প্রস্তুতি এই রেইল রিভাইভাল প্লানে নিশ্চিত করা হবে। দেশে ডিজাইন করা এসি, নন-এসি স্লিপার বগি ম্যানুফেকচার করা হবে, যেটায় থাকবে আধুনিক লো মেইন্টেইনেন্স হাই কমোড টয়লেট, রিডিং লাইট, ফ্যান। ঢাকা-নারায়নগঞ্জ- কুমিল্লা নতুন লাইন বসানো হবে, যা নতুন টাউনশিপ ও তার নতুন রেল স্টেশনকে যুক্ত করবে।

টেকসই আবাসন, বর্জ্য, নিরাপত্তা ও গভীর সমুদ্রবন্দর

আমাদের মতো টেকসই নগরায়নের ভিত্তি চারটি স্তম্ভ হলো আবাসন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা ও লজিস্টিক্স। সাশ্রয়ী আবাসনে ইনক্লুসিভ জোনিং, মিশ্র-আয় প্রকল্প, গ্রিন বিল্ডিং কোড ও হাঁটাচলা-বান্ধব নকশা বাস্তবায়ন করা হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমরা প্লাস্টিক নিয়ন্ত্রণ, Extended Producer Responsibility (EPR), উৎসে বর্জ্য আলাদা করা, কম্পোস্টিং ও বায়োগ্যাসের ওপর জোর দিবো। বর্জ্য-টু-এনার্জিতে ফিডস্টক মান নিশ্চিত করে করলে দূষণ কমাবো। নগর নিরাপত্তা ও দুর্যোগ প্রস্তুতিতে ড্রোন, থার্মাল ক্যামেরা, ডিজিটাল কমান্ড সেন্টার, পর্যাপ্ত ফায়ার হাইড্র্যান্ট স্থাপন এবং নিয়মিত অগ্নি ও ভূমিকম্প ড্রিল আমাদের অগ্রাধিকার। এছাড়া স্কুল, হাসপাতাল ও বাজারে লাইফ-সেফটি অডিট বাধ্যতামূলক করা হবে। গভীর সমুদ্রবন্দর ও বন্দরসংলগ্ন শিল্পাঞ্চলকে রপ্তানি ও লজিস্টিক্সে গুরুত্ব দেয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা, ম্যানগ্রোভ ও স্থানীয় জীবিকার বিষয়গুলো অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বন্দর ও শিল্প অবকাঠামোকে নেট -জিরো হিসেবে প্রস্তুত করতে গুরুত্ব দেয়া হবে।

আন্তর্জাতিক জলবায়ু কূটনীতিতে বাংলাদেশের ভূমিকা আরও শক্তিশালী করতে SREDA, IDCOL, BIFFL, শীর্ষস্থানীয় ESG-compliant প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে নির্বাচিত ৩০–৪০ জন তরুণ জলবায়ু এক্টিভিস্ট ও পেশাজীবীকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলন, নীতি সংলাপ ও বৈশ্বিক ফোরামে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।অর্থায়নে ওয়াক্ফ সুকুক, PPP ও মিউনিসিপ্যাল বন্ড এর মাধ্যমে সামাজিক ও নগর অবকাঠামোয় দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি আনারা ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও শক্ত প্রকল্প শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

১১। কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা

খাদ্য নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনে আমরা একটি দীর্ঘমেয়াদি, বিজ্ঞানভিত্তিক ও টেকসই কৃষি নীতি অবলম্বন করব। এতে আমাদের গুরুত্ব থাকবে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা, প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার , কৃষকের ন্যায্য আয় এবং প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের বিস্তার। আমাদের কৃষি নীতির মূল ভিত্তি হবে চারটি উপাদান: পানি, মাটি, বীজ ও শ্রম। পানি ব্যবস্থাপনায় বর্ষাভিত্তিক সেচ ক্যালেন্ডার প্রণয়ন, ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি, রেইনওয়াটার হারভেস্টিং এবং ছোট জলাধার ও খাল বিল পুনরুজ্জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এর ফলে পানি সংকট মোকাবিলা ও কৃষি উৎপাদনের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হবে। মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় জৈব সার ও জৈব পদার্থের ব্যবহার, ফসল পর্যায়ক্রমিকতা (Crop Rotation), কভার ক্রপিং এবং সংরক্ষণ কৃষি (Conservation Agriculture) উৎসাহিত করা হবে। এতে দীর্ঘমেয়াদে এগুলো মাটির উর্বরতা ও পানি ধারণক্ষমতা বাড়িয়ে উৎপাদন ব্যয় কমাবে। উচ্চমানের ও জলবায়ু সহনশীল বীজ নিশ্চিত করতে সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি ও কমিউনিটি ভিত্তিক বীজ ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করতে হবে। দেশীয় বীজ গবেষণা, সংরক্ষণ ও বিতরণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করে শুধু খাদ্য নিরাপত্তা নয়, খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা হবে। একই সঙ্গে কৃষিশ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বাড়ানো হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট লবণাক্ততা, খরা, অকাল বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ অঞ্চলের নিরাপত্তায় ফসল ক্যালেন্ডার পুনর্বিন্যাস, সহনশীল জাতের বিস্তার, বায়ুবাঁধ নির্মাণ এবং খাল বিল পুনরুদ্ধারে গুরুত্ব দেয়া হবে। এর সাথে উৎপাদন ঝুঁকি কমাতে উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্র আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ও ডিজিটাল আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা কৃষকের হাতে পৌঁছানো হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই ব্যবস্থাপনায়, মৌসুমি রোগ ও মহামারি প্রতিরোধ, মাত্রাতিরিক্ত এন্টাইবায়োটিকের ব্যবহার কমিয়ে সুষম পদ্ধতিতে লালন-পালনের জন্য নিয়মিত কারিগরি সহায়তা, ট্রেনিং ও পরামর্শ সভার আয়োজন এবং পশু চিকিৎসকের সরবরাহ বৃদ্ধি করা হবে।

আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নীতির কেন্দ্রে থাকবে পুষ্টি। একমাত্র চালনির্ভরতা থেকে বেরিয়ে ডাল, তেলবীজ, দুধ, ডিম, মাছ, ফল ও শাক সবজির উৎপাদন ও ভোগ বাড়াতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে পুষ্টিবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে গর্ভবতী নারী ও শিশুদের লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা এবং স্থানীয় বাজারে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের সহজলভ্যতা খাদ্য নিরাপত্তাকে স্বাস্থ্য নিরাপত্তায় রূপান্তর করবে। খাদ্য নিরাপত্তার শাসন কাঠামোতে সংস্কারের জনে ন্যায্য ন্যূনতম মূল্য, প্রোকিউরমেন্ট, মজুত ব্যবস্থাপনা ও লজিস্টিক্স সব ক্ষেত্রেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা হবে। উৎপাদনের বৈচিত্র্যের পাশাপাশি স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়াতে হবে। 'ফার্ম টু ফর্ক' চেইনের প্রতিটি ধাপে অর্থায়ন ও প্রণোদনা সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে।

কৃষিজমি সংরক্ষণ ও আধুনিক পরিবেশবান্ধব কৃষি

কৃষিজমি একবার শিল্প, আবাসন বা অবকাঠামোয় রূপান্তরিত হলে তা কার্যত চিরতরে কৃষি উৎপাদনের বাইরে চলে যায়। তাই কৃষিজমিতে কোনো শিল্প, আবাসন বা সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হবে না। এই 'নো–কনভার্শন' নীতি বাস্তবায়নে জোনিং, ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড, ভূমি ব্যাংক এবং কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা একযোগে প্রয়োগ করতে হবে। ভূমি সংরক্ষণে কমিউনিটি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ভূমি পর্যবেক্ষণ কমিটি, সমবায়ভিত্তিক সংরক্ষণ প্রণোদনা এবং অবৈধ প্লটিং স্থাপনা উচ্ছেদে দ্রুত ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে। জলাবদ্ধতা নিরসন ও খাল বিল পুনরুদ্ধারে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী আর্থিক ও আইনি ক্ষমতা দিতে হবে।

আমরা মনে করি শহর, পেরি আর্বান ও গ্রামাঞ্চলের জন্য পৃথক বিশেষায়িত পরিকল্পনা প্রয়োজন। শিল্প ও আবাসন সম্প্রসারণে ব্রাউনফিল্ড ও অব্যবহৃত জমির ব্যবহার, উল্লম্ব উন্নয়ন এবং মিশ্র ব্যবহারের নকশা উৎসাহিত করতে হবে। সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন জরুরি হলেও কৃষিজমির পরিবর্তে রুফটপ, ফ্লোটিং সোলার, ক্যানাল টপ, পার্কিং শেড ও পরিবহন করিডরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অ্যাগ্রিভোল্টাইকস স্থানীয় বাস্তবতায় খাদ্য উৎপাদনে ক্ষতি না ঘটালে তবেই পরীক্ষামূলক অনুমোদন পাবে।

কৃষিজমি সংরক্ষণ আরও কার্যকর করতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো হবে। স্যাটেলাইট ইমেজিং, ড্রোন সার্ভে ও GIS ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে জমি ব্যবহার পরিবর্তনের রিয়েল টাইম নজরদারি এবং বার্ষিক কৃষিজমি ইনভেন্টরি প্রকাশ নীতিগত জবাবদিহি বাড়াবে। কৃষিজমির মালিকদের জন্য কর রেয়াত, সেচ ইনপুটে ছাড় এবং পরিবেশবান্ধব চাষে বিশেষ সহায়তা ইতিবাচক প্রণোদনা হিসেবে কাজ করবে। মাটির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে খামারভিত্তিক কম্পোস্ট, বায়োগ্যাস স্লারি, ভের্মি কম্পোস্ট এবং শহুরে জৈব বর্জ্যের নিরাপদ কম্পোস্টিংয়ের মাধ্যমে 'সার সার্কুলারিটি' গড়ে তুলতে হবে। ইন্টিগ্রেটেড সয়েল ফার্টিলিটি ম্যানেজমেন্ট রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদন স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে।

স্মার্ট সেচ ড্রিপ, স্প্রিংকলার, সেন্স গাইডেড ও সৌরচালিত পাম্প জল ও জ্বালানি দক্ষতা বাড়াবে। IoT সেন্সর ও হাইপার লোকাল আবহাওয়া ডেটার ভিত্তিতে সেচ সিদ্ধান্ত নিয়ে অতিরিক্ত বা অপর্যাপ্ত সেচের ঝুঁকি কমানোতে গুরুত্ব দেয়া হবে। মেকানাইজেশনে স্মার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টার, রীপার, থ্রেসার ও কম্বাইন হারভেস্টার ক্ষুদ্র কৃষকের জন্য শেয়ারিং বা কাস্টম হায়ারিং সেন্টারের মাধ্যমে সহজলভ্য করতে হবে। ড্রোন স্প্রে, মাল্টিস্পেকট্রাল ইমেজিং দিয়ে রোগ শনাক্তকরণ এবং AI ভিত্তিক ডিটেকশন ও সাজেশন প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে সহায়তা দেয়া হবে। তবে প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় ভাষায় ইন্টারফেস, প্রশিক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা অপরিহার্য।

কৃষকের আর্থিক নিরাপত্তা, ন্যায্য বাজার ও মূল্য স্থিতিশীলতা

কৃষকের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো আবহাওয়া, বাজারদর, রোগ পোকা ও আর্থিক চাপের কারণে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা। এই ঝুঁকি কমাতে একটি শক্ত আর্থিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রয়োজন। সহজ শর্তে কৃষিঋণ নিশ্চিত করতে কৃষি ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও মাইক্রোক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। ঋণের কিস্তি ফসলচক্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, জামানতে নমনীয় এবং ডিজিটাল KYC ভিত্তিক দ্রুত বিতরণ ব্যবস্থা কৃষকের জন্য অর্থপ্রবাহ সহজ করবে। ফসল বীমা (বিশেষত আবহাওয়া সূচকভিত্তিক) ক্ষতির সময় দ্রুত নগদ সহায়তা দেবে। বিশেষত বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা বা বায়ুপ্রবাহ সূচকের সঙ্গে পেআউট যুক্ত থাকলে ক্ষতি যাচাইয়ের জটিলতা কমবে। সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগীর সমন্বয়ে প্রিমিয়াম সাবসিডি দিয়ে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো হবে।

ভর্তুকিতে স্বচ্ছতা আনতে NID লিংকড ক্যাশব্যাক পদ্ধতি চালু করা হবে। অনুমোদিত ডিলার থেকে সার, বীজ বা যন্ত্র কেনার পর ডিজিটাল রসিদের ভিত্তিতে ভর্তুকির অংশ সরাসরি কৃষকের ব্যাংক বা মোবাইল মানি অ্যাকাউন্টে ফেরত যাবে। এতে মধ্যস্বত্বভোগী ও জালিয়াতি কমবে এবং প্রকৃত কৃষক উপকৃত হবে। ঋণ, বীমা, ভর্তুকির সঙ্গে বাজার অ্যাক্সেস যুক্ত করা হবে। সমবায় বা প্রডিউসার গ্রুপের মাধ্যমে সমষ্টিগত দর কষাকষি, বাল্ক প্রোকিউরমেন্ট এবং ডিজিটাল মার্কেটপ্লেসে সরাসরি বিক্রির ব্যবস্থা কৃষকের মার্জিন বাড়ায়। মূল্য তথ্য, ক্রপ অ্যাডভাইসরি ও লজিস্টিক সহায়তা কৃষককে ন্যায্য বাজারে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে Crop Sales Centre (CSC) কে গুরুত্ব দেয়া হবে। সরকার অনুমোদিত CSC এ কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য ক্রয়, গ্রেডিং-সোর্টিং-প্যাকিং ও স্বচ্ছ নিলাম ব্যবস্থার মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগী নির্ভরতা কমানো হবে। এতে কৃষকের আস্থা বৃদ্ধিতে ডিজিটাল ওজন ও ই-রসিদ বাধ্যতামূলক করা হবে। মূল্য স্থিতিশীলতার জন্য কোল্ড স্টোরেজ ও বৈজ্ঞানিক ওয়্যারহাউজিং এ গুরুত্ব দেয়া হবে। আলু, পেঁয়াজ, ফল-সবজি ও প্রাণিজ পণ্যের জন্য জেলা উপজেলায় মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজ গড়ে তোলা হবে। ওয়্যারহাউজ রিসিট ফাইন্যান্স চালু হলে কৃষক মজুদের বিপরীতে ঋণ পাবে এবং তাৎক্ষণিক বিক্রির চাপ কমবে। সড়ক, রেল, নৌ ও বন্দর সংযোগের মাধ্যমে মাল্টিমোডাল লজিস্টিক উৎপাদন অঞ্চলকে বাজারের সঙ্গে যুক্ত করবে এবং অ্যাগ্রি লজিস্টিক হাব ও কোল্ড চেইন করিডর বিনিয়োগ সহজ করবে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ কৃষি অঞ্চলগুলো থেকে রাজধানী শহরে দ্রুত ও স্বল্প খরচে পণ্য পরিবহণ নিশ্চিত করতে বিশেষ আগ্রো ট্রেন চালু করা হবে। এতে উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে সরাসরি সংযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং মধ্যস্বত্বভোগীর চাপে কৃষকের ক্ষতি কমবে। ই-টেন্ডারিং, ই-অকশন ও মান লেবেলিং এর মাধ্যমে আমরা বাজারে জবাবদিহি বাড়াবো। মূল্য স্থিতিশীলতা জাতীয় চাহিদা উৎপাদন ডেটাবেস ছাড়া সম্ভব নয়। রিয়েল টাইম উৎপাদন, স্টক, আবহাওয়া ঝুঁকি ও আমদানি রপ্তানি তথ্য নীতিনির্ধারকদের দ্রুত সিদ্ধান্তে সহায়তা করবে। এজন্য ওপেন ডেটা পোর্টালে নিয়মিত আপডেটের মাধ্যমে নাগরিক আস্থা বৃদ্ধি করা হবে।

গবেষণা, ভেজাল দমন, সবুজায়ন ও আবহাওয়া সতর্কতা

দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদনশীলতার জন্য আমরা গবেষণা ও উদ্ভাবনে গুরুত্ব দেব। BARI, BRRI এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে লক্ষ্যভিত্তিক অর্থায়ন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শিল্প অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হবে। উচ্চ ফলনশীল, পুষ্টিসমৃদ্ধ ও জলবায়ু সহনশীল জাত উদ্ভাবনের পাশাপাশি প্রিসিশন এগ্রিকালচার, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ও চারা উৎপাদনে গবেষণা বাড়ানো হবে। গবেষণার ফল মাঠে পৌঁছাতে এক্সটেনশন ব্যবস্থার সংস্কার করা হবে। উপজেলা কৃষি অফিস, ব্লক সুপারভাইজার, প্রাইভেট এক্সটেনশন ও এগ্রি স্টার্টআপ একসঙ্গে কাজ করে 'লাস্ট মাইল' জ্ঞান পৌঁছে দেবে। ফার্মার ফিল্ড স্কুল, ডেমো প্লট, ভিডিও অ্যাডভাইসরি ও চ্যাটবট প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবো।

খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও ভেজাল দমনে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করবো। গ্রাসরুট পর্যায়ে ল্যাব সক্ষমতা, মোবাইল টেস্টিং ইউনিট এবং ট্রেসেবিলিটি চালু করা হবে। ভেজাল প্রমাণিত হলে জরিমানা, ফৌজদারি দায় ও লাইসেন্স বাতিল তিনটিই শাস্তিই কার্যকর করা হবে। ভেজাল চক্র ভাঙতে ভোক্তার জন্য কুইক রিপোর্ট ও হুইসেল ব্লোয়ার প্রণোদনা বৃদ্ধি করা হবে। নকল বীজ বা নিম্নমানের সারের বিরুদ্ধেও একই রকম দৃঢ়তা প্রদর্শন করা হবে। সিড সার্টিফিকেশন, ডিলার অডিট ও মানদণ্ড বাধ্যতামূলক করা হবে।

রাস্তা, মহাসড়ক ও নগরে ফলজ-বনজ গাছের মিশ্র রোপণের মাধ্যমে তাপদ্বীপের প্রভাব কমাবো ও ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদন বাড়াবো। কমিউনিটি-চুক্তিভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণ ও 'অ্যাডপ্ট-এ-ট্রি' কর্মসূচির মাধ্যমে গাছ টিকে থাকার হার বাড়ানো হবে। ছাদ ও কমিউনিটি গার্ডেন ভিত্তিক নগর কৃষিকে উৎসাহ দেয়া হবে। উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্র আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে রিয়েল-টাইম ডেটা সংগ্রহ করে আমরা কৃষিপরামর্শকে হাইপার-লোকাল করতে চাই। এই ডেটা কৃষি অ্যাপ ও এসএমএসের মাধ্যমে কৃষকের হাতে সহজে পৌঁছে দিয়ে সেচ, কীটনাশক প্রয়োগ ও ফসল কাটার সিদ্ধান্ত আরও নির্ভুল করা হবে।

১২। পররাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব

আমরা বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশের স্বার্থে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি সবসময় দলীয় স্বার্থ ও সংকীর্নতার উর্ধে থাকবে। এনসিপি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি রক্ষার প্রশ্নে আপোষহীন থাকবে। আমরা পারস্পরিক সম্মান ও সম-মর্যাদার ভিত্তিতে বৈদেশিক সম্পর্ক গড়ে তুলবো। প্রতিবেশী ও আঞ্চলিক রাষ্ট্রসমুহের সাথে কূটনীতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহযোগিতা ও সর্বোপরি, বাংলাদেশের সামগ্রিক স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে। ভূরাজনৈতিক ও আঞ্চলিক বিরোধপুর্ন ইস্যুতে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য প্র্যাগমেটিক পজিশন (Hedging) বজায় রাখবে। শক্তিশালী প্রতিরক্ষা সক্ষমতা ছাড়া কার্যকরী বৈদেশিক নীতি সম্ভব নয়। আমাদের সমন্বিত প্রতিরক্ষা নীতির কেন্দ্রে থাকবে সংসদীয় নজরদারি, নাগরিক অধিকার রক্ষা, এবং আঞ্চলিক শান্তি ও কূটনৈতিক ভারসাম্যের প্রতি প্রতিশ্রুতি।

ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক

ভারতের সাথে সমতা, পারস্পরিক মর্যাদা ও ন্যায্যতা ভিত্তিতে আমরা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র-টু-রাষ্ট্র (sovereign -to-sovereign) কৌশলগত সম্পর্ক চাই। কোনো ধরনের আগ্রাসনবাদী আচরণ, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা একতরফা সুবিধা আদায়ের নীতি গ্রহণযোগ্য নয়। ভারত যদি আমাদের সাথে সুসম্পর্ক চায় তবে ভারতের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী সন্ত্রাসীদের বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় ফেরত দেয়াকে আমরা সম্পর্ক উন্নয়নের পথে প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচনা করব। এছাড়া আওয়ামী আমলের সকল অসম চুক্তি, সীমান্ত হত্যা, আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানির ন্যায্য হিস্যা, বঙ্গোপসাগরের সার্বভৌম জলসীমায় অনুপ্রবেশসহ সকল অমীমাংসিত ইস্যু সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পর্যায়ে কাঠামোবদ্ধ সংলাপের মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হবে। কিন্তু ভারতের অসহযোগীতার কারণে সেই দ্বিপাক্ষিক সংলাপ ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ তার কৌশলগত, আইনি ও বহুপাক্ষিক বিকল্পসমূহ বিবেচনা করবে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা, সালিশি প্রক্রিয়া ও আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষায় সর্বোচ্চ দৃঢ়তা প্রদর্শন করবে।

মায়ানমারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক

রোহিঙ্গা সংকটকে বাংলাদেশ একটি মানবিক ও নিরাপত্তা-সংকট হিসেবে বিবেচনা করে। এর টেকসই সমাধানের জন্য দ্বিপাক্ষিক কূটনীতির পাশাপাশি আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক ফোরামে সক্রিয় কৌশল গ্রহণ করা হবে। মায়ানমারের অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জনগণের জীবন, সম্পদ ও নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়লে তা জাতীয় নিরাপত্তার সরাসরি লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হবে। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার নাগরিকদের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় সকল প্রতিরক্ষামূলক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে প্রস্তুত থাকবে। এর মধ্যে সীমান্তের কঠোর নিরাপত্তা, সীমান্ত তল্লাশি বৃদ্ধি, প্রয়োজন অনুযায়ী সামরিক ও পুলিশি প্রস্তুতি, এবং স্থানীয় জনগণকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বহুমাত্রিক ও ভারসাম্যপূর্ণ হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে সংযুক্তি বাড়াতে আসিয়ানে যোগদান হবে একটি অগ্রাধিকার লক্ষ্য। চীনের সাথে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ক জোরদার করে বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি স্থানান্তর বৃদ্ধি করা হবে। ওআইসি সদস্য দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ় করা হবে। মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের শ্রমবাজারে দক্ষ বাংলাদেশী জনশক্তির প্রবেশ ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেয়া হবে। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী অভিবাসীদের আইনি অধিকার, নিরাপত্তা ও বৈধ অভিবাসন সম্প্রসারণে দ্বিপাক্ষিক ও ইইউ পর্যায় কূটনৈতিক আলোচনা জোরদার করা হবে। এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন-পরবর্তী বাস্তবতায় রপ্তানি পণ্যের বাজার সুবিধা ধরে রাখতে বিশেষ বাণিজ্যিক নেগোসিয়েশন চালানো হবে। শান্তি, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, পরিবেশ রক্ষা, ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সার্ক, আসিয়ান, ওআইসি, ন্যাম, জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সক্রিয় অংশীদারত্ব গড়ে তোলা হবে। আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী নই, কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে অন্যতম। আমরা আন্তর্জাতিক মঞ্চে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জন্য ন্যায়পরায়ণ জলবায়ু নীতি নিশ্চিত করতে কাজ করে যাবো। শুধু মাত্র স্টেট এক্টর নয়, প্রতিটি দেশের আন্ত যোগাযোগ ও তাদের ইনসাফ নিশ্চিতকরণে নাগরিকদের সাথে মানবিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সুসংহত পাবলিক ডিপ্লোম্যাসিকে গুরুত্ব দিবো। দক্ষিণ এশিয়া, গ্লোবাল সাউথসহ বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের প্রতি বাংলাদেশের থাকবে অকুণ্ঠ সমর্থন, সহযোগিতা ও সংহতি। এই লক্ষ্যে সেসব দেশ ও অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশে বৃত্তিসহ উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে। বঙ্গোপসাগর কেন্দ্রিক নৌপথে প্রতিবেশী ও আঞ্চলিক রাষ্ট্রসমুহের সাথে বাণিজ্য যোগাযোগ ও সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ও সামরিক নৌ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। এজন্য বাংলাদেশের সামুদ্রিক বন্দর, নদী বন্দর ও বন্দর কেন্দ্রিক লজিস্টিক্স সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বৃহৎ বিনিয়োগ করা হবে।

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনো ধরনের বিদেশি হস্তক্ষেপ সহ্য করা হবে না। রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে দিয়ে আগের মত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমন নয়, বরং বহিঃশত্রুর আগ্রাসন ও ষড়যন্ত্র থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত করা হবে। বিশেষত সাইবার সিকিউরিটি এবং সোশাল মিডিয়ায় ডিসইনফরমেশন প্রতিরোধে বিশেষায়িত ইউনিট গঠন করা হবে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও অর্থনৈতিক খাতে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের জন্য কঠোর ভেটিং ও নিরাপত্তা ক্লিয়ারেন্স ব্যবস্থা চালু করা হবে। একই সঙ্গে এসব খাতে বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রস্তুত করতে আধুনিক প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ-বিরোধীতা

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য শিক্ষা, গণমাধ্যম ও ডিজিটাল কনটেন্ট নীতিতে বাংলাদেশি ভাষা, লোকজ সংস্কৃতি ও দেশীয় সৃজনশীল শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পাঠ্যক্রমে বাংলা ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতিচর্চা শক্তিশালী করা হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা নিজ সাংস্কৃতিক শিকড় সম্পর্কে সচেতন হয়। রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি

গণমাধ্যমে দেশীয় কনটেন্টের ন্যূনতম উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে এবং স্থানীয় শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হবে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশি কনটেন্ট নির্মাণে প্রণোদনা ও দক্ষতা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হবে। বিদেশি সাংস্কৃতিক আধিপত্যের একচেটিয়া প্রভাব মোকাবিলায় নীতি ও সচেতনতার মাধ্যমে ভারসাম্য রক্ষা করা হবে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো একটি আত্মবিশ্বাসী ও বহুমাত্রিক বাংলাদেশি সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

প্রতিরক্ষা কৌশল

আমরা বিশ্বাস করি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা সক্ষমতা ছাড়া কার্যকরী বৈদেশিক নীতি সম্ভব নয়। বিশেষ করে আমাদের দেশের ভৌগলিক অবস্থান, বর্তমান বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং গত কয়েক বছরের বেশ কয়েকটি বড় দেশের সাথে অপেক্ষাকৃত ছোট দেশের যুদ্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের উপর জোড় দেয়া দরকার। আমাদের প্রতিরক্ষা কৌশলের কেন্দ্রে থাকবে নিজস্ব ভূ-প্রাকৃতিক গঠন, যা নদী-বিধৌত অঞ্চল ও বঙ্গোপসাগর-কেন্দ্রিক নিরাপত্তা চাহিদা মাথায় রেখে সুসমন্বিতভাবে গড়ে তোলা হবে। রাষ্ট্রীয় সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে, আমরা একটি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করবো। আমাদের সমন্বিত প্রতিরক্ষা নীতির কেন্দ্রে থাকবে সংসদীয় নজরদারি, নাগরিক অধিকার রক্ষা, এবং আঞ্চলিক শান্তি ও কূটনৈতিক ভারসাম্যের প্রতি প্রতিশ্রুতি।

রিজার্ভ ফোর্স তৈরি

গণপ্রতিরক্ষা দর্শনের ভিত্তিতে দেশের আত্মরক্ষা সক্ষমতা বাড়াতে প্রতি বছরে ৩০ হাজার তরুণকে বেসিক অস্ত্র ও মিলিটারি ট্যাকটিক্স ট্রেইনিং এর মাধ্যমে তিনবাহিনীর জন্য কমব্যাট-রেডি এবং দূর্যোগ পরিস্থিতির জন্য তৈরি করা হবে। এই ট্রেনিং হবে ১০-সপ্তাহ মেয়াদী এবং রিজার্ভিস্টদের বছরে দুই সপ্তাহ করে রিফ্রেশার ট্রেনিং-এ অংশ নিতে হবে। আমাদের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য, প্রচলিত বাহিনীর দ্বিগুণ আকারের রিজার্ভ ফোর্স প্রস্তুত করা।

খরচ: ট্রেইনিং ফ্যাসিলিটির এককালীন খরচ ৫০০ কোটি টাকা; বাৎসরিক খরচ ৪০০ কোটি টাকা

আনসারের বিদ্যমান ফ্যাসিলিটি রিজার্ভ ফোর্সের জন্য আপগ্রেড করা সম্ভব হলে ১০-১৫% খরচ কমানো সম্ভব।

সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল অধিগ্রহণ

কার্যকর আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির লক্ষ্যে পাঁচ বছরের মধ্যে মাঝারি পাল্লার অন্তত আটটি সারফেস-টু-এয়ার (SAM) মিসাইল ব্যাটারি অধিগ্রহণ করা হবে এবং বিদ্যমান উদ্যোগ এগিয়ে নেয়া হবে। এতে পরবর্তীতে দূরপাল্লার মিসাইল যুক্ত করা যাবে।

পাঁচ বছরের খরচ: ১০ হাজার কোটি (LY-80) থেকে ১৫ হাজার কোটি টাকা (HISAR-O)

ড্রোন ব্রিগেড তৈরি

সর্বাধুনিক ড্রোন প্রযুক্তি অধিগ্রহণ, দেশীয় সামরিক গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ এবং উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে একটি UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ব্রিগেড গঠন করা হবে। এ লক্ষ্যে ড্রোন বিষয়ক বর্তমান উদ্যোগসমূহ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

পাঁচ বছরের খরচ: ২৫০০ কোটি টাকা

ব্রিগেডের আকার: ~ ১০ টি স্ট্রাইক UAV, ৩০ টি ISR UAV, ১০০-২০০ শর্ট রেঞ্জ ড্রোন, ২০০০ পার্সোনেল